দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার তৃণমূলী কৌশল গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক
— পৃঃ ১৪

দেশে গোহত্যা বন্ধ হওয়ার জন্য কেন্দ্রের নোটিফিকেশন কার্যকর হওয়া উচিত—পৃঃ ১৬

৬৯ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ১২ জুন ২০১৭।। ২৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

ব্রহ্মাবর্ত : দশ হাজার বছরের বৈদিক সভ্যতার পীঠস্থান

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১২ জুন - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

কলকাতার সাংবাদিক মহলে এখন প্রবল মমতাপ্রীতি চলছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : দেশের সর্বকালের সেরা 'সেলসম্যান' নরেন্দ্র মোদী ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

হিন্দু ভাবাবেগ বিজেপিকে জয়যুক্ত করলে সেকুলারিজম ধ্বংস হবে? ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার তৃণমূলী কৌশল গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৪

দেশে গোহত্যা বন্ধের জন্য কেন্দ্রের নোটিফিকেশন কার্যকর হওয়া উচিত ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৬

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : ব্রহ্মবর্ত ঃ দশ হাজার বছরের বৈদিক সভ্যতার পীঠস্থান ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৯

পশ্চিমবঙ্গ ফতোয়াবাজদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ২২

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সঙ্কটে : জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান অনিবার্য ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ২৭

দুর্বলতা ও ভয় নিরসনে গীতার দুটি মহাবাক্য ▯ সুনীল কুমার দাস ▯ ৩১

বাবা-মা'র সংস্কার শিশু প্রথম পায় মাতৃজঠরে ▯ স্বপন দাস ▯ ৩২

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-কন্যা ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩৩

অঙ্গনা : পরিবেশ রক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩৪

সুস্বাস্থ্য : রোগ নিরাময়ে ডান্স থেরাপি ▯ কেকা মজুমদার ▯ ৩৫

খেলা : আই ও এ-কে নিয়ে মনিটারিং কমিটি গড়ল কেন্দ্র ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় ও সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০**

অন্যরকম : ৩৬ ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯

চিত্রকথা : ৪১

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ৩ জুলাই, ২০১৭

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদানের পর প্রতিবছর স্বস্তিকা শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা প্রকাশ করে চলেছে। শ্যামাপ্রসাদ-চর্চার ক্ষেত্রে এ এক অনন্য নজির। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যায় আলোচনা করবেন মানস ঘোষ, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, মোহিত রায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটি অগ্রিম বুকিং করুন।

।। দাম একই থাকছে— ১০.০০ টাকা।।

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

যোগদিবস

বিশ্বজুড়ে ২১ জুন তারিখটি 'যোগদিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। যোগ হলো এক জীবন দর্শন, যা আমাদের মহত্তর জীবনের সন্ধান দেয়। আগামী সংখ্যায় এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন ডা: দিব্যসুন্দর দাস। সেইসঙ্গে থাকছে সাম্প্রতিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে লেখা। লিখেছেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

।। দাম একই থাকছে— ১০.০০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাফল্যের ক্ষেত্রে শুধু 'ইসরো' কেন?

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করিয়া সাফল্যের সহিত জি এস এল ভি—মার্ক-থ্রি রকেটটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করিল ইসরো (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেসন)। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশকেন্দ্র হইতে কৃত্রিম উপগ্রহ 'জিস্যাট-১৯'-কে লইয়া মহাকাশে পাড়ি দেয় 'ফ্যাট বয়' নামাঙ্কিত এই রকেট। ৪৩.৪৩ মিটার লম্বা 'জি এস এল ভি—মার্ক থ্রি' ভারতীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত সর্বাপেক্ষা ভারী রকেট। ওজন ৬৪০ টন যাহা ২০০টি পূর্ণবয়স্ক হাতির সমান। সেই সঙ্গে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীও। ভারী এবং অতি ভারী উপগ্রহ মহাকাশে পৌঁছানোর জন্যই এই রকেট তৈরি করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় রকেট এত ভারী উপগ্রহ বহন করে নাই। এতদিন এই ধরনের ভারী উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) বিদেশি রকেট ভাড়া করিয়া পাঠাইতে হইত। ইহার জন্য বিপুল অর্থও ব্যয় করিতে হইত। ইহার আগে 'জিস্যাট-১৮' (ওজন ৩৪০৪ কেজি) পাঠানো হইয়াছিল ফরাসি রকেটের মাধ্যমে। খরচ হইয়াছিল ৪০০ কোটিরও বেশি টাকা। এখন ভারতকে তাহা আর খরচ করিতে হইবে না। বরং বিদেশের অনেক বেশি সংখ্যক উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাইয়া বিদেশি মুদ্রা আয়ের রাস্তাও সুগম হইল। ডিজিটাল ভারত গঠনের প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চার হইল। ইসরোর এই সাফল্য তাই মহাকাশ গবেষণা এবং মহাকাশ বাণিজ্য—দুই ক্ষেত্রেই ভারতকে বেশ কয়েক কদম আগাইয়া দিল। একদিকে যেমন মহাজাগতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বহু দুর্লভ তথ্য এই দশ বছরে সংগ্রহ করিবে 'জিস্যাট-১৯', তেমনই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করিবে। গতি বাড়াইবে ইন্টারনেটের। মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করিবে। অন্যদিকে মহাকাশ বাণিজ্যে ভবিষ্যতে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করিবে ভারত। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইউরোপের সঙ্গে ভারতও পাল্লা দিতে পারিবে। ভবিষ্যতে ভারত মহাকাশে নভোশ্চর পাঠাইতে চাহিলে আর অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

এই সাফল্যের একটি বড় দিক হইল দেশীয় প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন যাহার সাহায্যে আগের তুলনায় ভারী ওজনের রকেট পাঠানো সম্ভব হইল। প্রথমে রাশিয়ার তৈরি এই ইঞ্জিন পাওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে আমেরিকা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এমনকী ভারত অন্য কোনো দেশ হইতেও এই ইঞ্জিন যাহাতে না পায় তাহারও চেষ্টা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীরাই এই ইঞ্জিন তৈরি করিতে সমর্থ হয়। আজ যেসব সংস্থার সাফল্যের কারণে ভারত বিশ্বে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইল ভারতীয় অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান সংগঠন। মাত্র কয়েক মাস আগেই ইসরো একসঙ্গে ১০৪টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাইয়াছে। মঙ্গল অভিযানের ক্ষেত্রেও সাফল্য লাভ করিয়াছে।

ইসরো-র এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক যে ভারতের অন্যান্য প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলি এই সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না কেন? বিশেষত ডি আর ডি ও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেসন) যুদ্ধ বিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ নির্মাণে এত পিছাইয়া কেন? যুদ্ধ বিমান নির্মাণ করিতে এক দশক অতিক্রান্ত হইয়া যাইল—ইহা কোনো সন্তোষের বিষয় নয়। যদি আমরা বিশ্বে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিতে চাই তবে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর সর্বপ্রেক্ষা বড় ক্রেতা হিসাবে নয়, উৎপাদক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ঘটনা হইল সামান্য অস্ত্রও আমাদের বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়। ইহা শুধু যুদ্ধোপকরণের ক্ষেত্রেই নয়, আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক অন্যান্য উপকরণ ও যন্ত্রাদির ক্ষেত্রেও ইহা সমানভাবে সত্য। ইসরোর সাফল্যে গর্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছি না কেন, আমাদের নীতি-নির্ধারকদের এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সাফল্যের ক্ষেত্রে শুধু ইসরো নয়, অন্য সংগঠনগুলির মুকুটেও নতুন পালক জুড়িতে হইবে।

সুভাষিতম্

স জীবতি যশোয়স্য কীর্তির্যস্য স-জীবতি।
অয়শোঽকীর্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ।।
সফল ও কীর্তিমান ব্যক্তিই জীবিত থাকে। অসফল ও কীর্তিহীন ব্যক্তি জীবিত থাকলেও মৃত সমান।

ইভিএম অভিযোগ : নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জের সামনে নাজেহাল অভিযোগকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের পর মায়াবতী সমেত অনেক বিরোধী রথী মহারথীরাই আঙুল তুলেছিলেন নির্বাচন কমিশনের দিকে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু ইভিএম। দিল্লির বিধানসভা ভবনে আপের এক সদস্য তো আবার হাতে কলমে ইভিএম মানে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন কী করে কারচুপি করে, তা করে দেখালেন একটি বাজার থেকে কিনতে পারা যায় এমন একটি ডামি ইভিএমে। ডজন খানেক অভিযোগ, দেশের ডজন খানেক প্রধান রাজনৈতিক দলের। এত অভিযোগের যোগ্য জবাব দিতে আসরে নামল নির্বাচন কমিশন। তারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ওই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। নির্বাচনে ইভিএমে কারচুপি করা হয় আর করা যায় (রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ), সেগুলি তাদের দেওয়া মেশিনে এসে করে দেখাক তারা। এই চ্যালেঞ্জ ডাকা

নাসিম জাইদি

হয়েছিল এক শনিবারে, (৩ জুন, ২০১৭)। আর এখানেই দেখা গেল অবাক করা এক মজার ব্যাপার। ১২টি অভিযোগকারী দলের মধ্যে হাজির শুধু সিপিএম আর এনসিপি। নির্বাচন কমিশনের তরফে তাদেরকে বলা হলো, কীভাবে ইভিএম হ্যাক করা হয়, সেটি করে দেখাক। অপর দলগুলিকেও মিডিয়া মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়, এই চ্যালেঞ্জ চার ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করে প্রমাণ করে দেখান। নইলে অভিযোগটি অসত্য, সেটা মেনে নেওয়া হবে। এদিকে সিপিএম ও এনসিপি-র প্রতিনিধিরা অপ্রস্তুতে পড়ে যান। তারা বলেন যে তারা বিষয়টি দেখতে, জ্ঞান নিতে ও শিখতে এসেছেন। এর বেশি আর কিছুই নয়। আর ওদিকে সব থেকে গলা ফাটানো মায়াবতী আর কেজরিয়াল, তাদের মুখে কোনো রা নেই।

দিনের শেষে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নাসিম জাইদি সাংবাদিকদের জানান যে ভারতের নির্বাচনে প্রত্যেকটি ইভিএম-ই ১০০ শতাংশ সঠিক। এবং এখন থেকে প্রত্যেকটি ইভিএমের সঙ্গে ভিভি প্যাট থাকবে। এই ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে, হ্যাক বা পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এটির সাহায্যে উপযুক্ত উত্তর দিতে পারবে কমিশন, আর পুনর্নির্বাচনের বিষয়টিও কম হবে।

কেরলে হিংসা দিয়ে বিজেপিকে রোখা যাবে না, হুঙ্কার অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিংসা দিয়ে কেরলে বিজেপির বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যাবে না, স্পষ্ট ভাষায় কেরলের সিপিএম সরকারকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নিজের শহর কান্নুরে যেভাবে লাগাতার বিজেপি আর এস এস কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে তার কঠোর নিন্দা করে একে দেশের কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত করেন বিজেপি সভাপতি। তিরুবন্তপুরমে গত ৪ জুন দলীয় কার্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি সিপিএমকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন : 'যদি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীরা ভেবে থাকেন হিংসা দিয়ে বিজেপির বৃদ্ধি আটকাবেন, তাহলে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।' তিনি আরও বলেন যে কেরলে সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ জোট ক্ষমতায় আসার পরই বিজেপির ওপর অমানবিক বর্বরোচিত আক্রমণের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সিপিএমের হাতে বিজেপি- আরএসএসের অন্তত ১৩ জন সক্রিয় সদস্যকে খুন হতে হয়েছে। একই সঙ্গে অমিত শাহ জানান একদিকে এর বিরুদ্ধে যেমন রাজনৈতিক প্রতিরোধ চলবে, অন্যদিকে আইনি পথে দুষ্কৃতীদের যাতে সাজা দেওয়া যায় সেই বিষয়টিও দেখা হবে।

বিজেপির নতুন কার্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকে কেরলে আগামীদিনে এনডিএ সরকারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীশাহ বলেন, 'কেরলে বিজেপি নিজেদের আরও প্রসারিত করতে প্রস্তুত। সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ ও কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফের পালা বদল শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যের মানুষ ক্লান্ত। তাঁরা এর থেকে মুক্তি চাইছেন। এদের বিকল্প হিসেবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ উঠে আসছে। আগামীদিনের কেরলে সরকার গড়ার ব্যাপারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' তিনি দলীয় কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে জনসঙ্ঘের দশজন সংসদ নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে পার্টিকর্মীদের কর্মনিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের মধ্যে দিয়ে আজ পৃথিবীর বৃহত্তম ১১ কোটি সদস্যের দলে পরিণত হয়েছে। দলীয় কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্য রাজ্য নেতাদের সঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি কুমানম রাজাশেখরন এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিধায়ক ও রাজাগোপাল উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩-৫ জুন কেরল সফর করেন অমিত শাহ।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সম্মেলনে বন্দারু দত্তাত্রেও

শীঘ্রই পেশ হতে চলেছে মজুরি বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের অষ্টাদশ ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেও বলেছেন, 'আমাদের সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির সঙ্গে প্রকৃত মজুরি বেঁধে দেওয়ার কথাও ভাবছে।

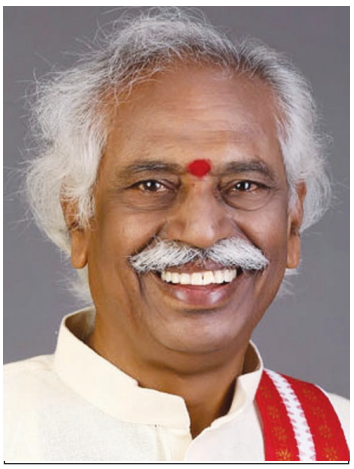

একটি ইউনিভার্সাল ওয়েজ কোড বিল শীঘ্র সংসদে পেশ করা হবে। বিলটি পাশ হয়ে গেলে কোনো রাজ্য শ্রমিকদের নির্ধারিত মজুরির থেকে কম দিতে পারবে না। বেশি অবশ্য দিতে পারবে। সেই সঙ্গে পেনশনভোগী সরকারি কর্মচারীরাও যাতে ইএসআই হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পান তাও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।' বন্দারু দত্তাত্রেও আরও বলেন, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ৯৩ শতাংশ শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার এখন কাজ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল এবং মনরেগা প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। পরে অন্য ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের (বিএমএস) ২৬টি রাজ্য ইউনিটের ৫০০০ প্রতিনিধি, ৫৩০০ ইউনিয়ন এবং ৩৩টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন এই সম্মেলনে অংশ নেয়। সম্মেলনের শেষ দিনে প্রবীণ ব্যবহারজীবী সি কে সূর্যনারায়ণ বি এম এসের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। ব্রজেশ উপাধ্যায় আগের মতোই সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। জগদীশ যোশী নতুন কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন।

সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ভিত্তি হিসেবে সংগঠিত শক্তির কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠাতা দত্তোপন্থ ঠেংড়ি-র আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। বি এম এসের অন্যতম পদাধিকারী অশোক ভগত বলেন, 'আমাদের এই শ্রমিক সংগঠন দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে।' সম্মেলনে দেশের সার্বিক উন্নতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য মডেল নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. বজরঙ্গলাল গুপ্তা বলেন, মডেলটি সর্বাংশে ভারতীয় হওয়া প্রয়োজন। সম্মেলনে নীতি আয়োগে কৃষক শ্রমিক এবং স্বনিযুক্ত কর্মীদের প্রতিনিধিত্বের দাবি ওঠে। সম্মেলনের অন্যতম মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল কর্মরতা মহিলাদের নানা সমস্যা। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় মহিলা প্রমুখ সীতাতাই গুণ্ডে সামাজিক বিকাশে সদর্থক ভূমিকা পালনের জন্য মহিলাদের আহ্বান জানান।

'কমব্যাট ফোর্সে' মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমাদের সেনাবাহিনীর কমব্যাট ফোর্সের এতদিনের এক বিধি ভাঙতে চলেছে। সেনাবাহিনীর এই ফোর্সে এতদিন শুধুমাত্র পুরুষরাই সুযোগ পেতেন। এবার পুরুষদের পাশাপাশি আমাদের দেশের নারীশক্তির মানে দুর্গাশক্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে চলেছে সেনাবাহিনী। আর্মি চীফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'আমি দেখতে চাই একজন নারী জওয়ানদের মতো সেনাবাহিনীতে

আসুন। আর আমি চাই এঁদের দ্রুত সেই সুযোগ দিতে। আমরা প্রথমে এই সব নারীশক্তিতে মান্যতা দেব পুলিশ জওয়ান হিসেবে'। প্রসঙ্গত পৃথিবীর ১৫টি দেশ নারীশক্তিকে তাদের সোনাবাহিনীর কমব্যাট এর ভূমিকায় নিয়েছে। এদের মধ্যে অবশ্যই নাম করতে হয় মার্কিন সেনাবাহিনী, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী, ইসরায়েল, জার্মানি আর অস্ট্রেলিয়ার। অবশ্য আমাদের দক্ষিণ এশিয় দেশের মধ্যে শুধুমাত্র শ্রীলঙ্কা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে নারীদের কয়েকটি ক্ষেত্রে যুক্ত রেখেছে, সেগুলি হলো, মেডিকেল, সিগন্যালস, অ্যাভিয়েশন, লিগ্যাল, এডুকেশনাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং। এতদিন 'কমব্যাট' ক্ষেত্রটিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি ছিল না। এবার চেষ্টা চলছে অন্তর্ভুক্তকে করার। ইতিমধ্যে তিনজন মহিলা পাইলট এসেছেন সেনাবাহিনীতে। মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকে সেনাবাহিনীর সবাই স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সামান্য হলেও একটু দেরি হয়ে গেল। উইং কমান্ডার (অবসরপ্রাপ্ত) অনুপমা যোশী দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই লড়ছেন যাতে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে মহিলাদের পার্মানেন্ট কমিশন হয়। তিনি বলেন, 'এটি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত, মহিলারা ইতিমধ্যেই সিআইএসএফ ও সি আর পি এফ-এতে কাজ করে যথেষ্ট প্রশংসিত। একটু দেরি হলেও ঠিক হলো।'

কার্তুজের কারখানার তথ্য গোপন, ব্যাঙ্কের সঙ্গে জালিয়াতি

এনডি টিভির দপ্তরে সিবিআই তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এনডি টিভির প্রতিষ্ঠাতা প্রণয় রায়, তাঁর স্ত্রী রাধিকা রায়, একটি বেসরকারি কোম্পানি এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিবি আই অভিযোগ নথিবদ্ধ করেছে। সিবি আই সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, এদের জন্য একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যে কারণে সিবি আই-এর তদন্তকারী অফিসারেরা সম্প্রতি দিল্লি ও দেরাদুনের চার জায়গায় তল্লাশি চালান। তাদের অভিযোগ এনডি টিভির বিরুদ্ধে, নাকি ব্যক্তিগতভাবে প্রণয় রায় ও তাঁর স্ত্রী বিরুদ্ধে, সিবি আই অফিসারেরা এখনও তা স্পষ্ট করে জানাননি।

খবরে প্রকাশ, লোকসানে চলা কার্তুজের খোল তৈরির একটি কারখানার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে প্রণয় রায় ও রাধিকা রায় আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ১৯ শতাংশ সুদে ৩৭৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এই ঘটনার ঠিক দু'দিন পর প্রণয় রায় নিজের অ্যাকাউন্টে ২১ কোটি এবং স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৭১ কোটি টাকা স্থানান্তরিত করেন। ব্যাঙ্কের প্রাপ্য সুদ ফাঁকি দেওয়াই এর উদ্দেশ্য বলে অভিযোগ করেছে সিবিআই। সেই সঙ্গে, কর ফাঁকিও এর আর একটি কারণ বলে জানিয়েছে আয়কর দপ্তর। এই পরিপ্রেক্ষিতে আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে চায় সিবি আই। বিশেষ করে মানি লন্ডারিং-এর কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা তা-ই এখানে বিচার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে কোম্পানিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে সেই আর আর পি আর (রাধিকা রায় প্রণয় রায়) হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড এনডি টিভিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সিবিআই-এর তদন্তে যে প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে তা মোটামুটি এইরকম। (১) ঋণ নেবার সময় কী বন্ধক রাখা হয়েছিল? (২) এই চুক্তিতে এনডি টিভি ঘনিষ্ঠ তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের কী ভূমিকা ছিল? (৩) কীসের জন্য ব্যাঙ্ক একটি সুদ-সহ ঋণকে সুদবিহীন ঋণে রাপান্তরিত করল? (৪) কীসের ভরসায় আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক একটি প্রায় আয়বিহীন কোম্পানিকে এত টাকা ঋণ দিল?

আয়কর দপ্তরের অভিযোগ, প্রণয় রায় দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের অনৈতিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। উদাহরণ স্বরূপ তারা তাদের রিপোর্টে ২০১০ সালে ৫৩.৮৪ কোটি টাকা তছরুপের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া প্রণয় রায়ের কোম্পানির দেওয়া কাগজপত্রেও মিলেছে বেশ কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য। যেমন প্রণয় রায়ের কোম্পানির তরফে দাবি করা হয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের যাবতীয় নথিপত্র আয়কর দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। আয়কর দপ্তর জানিয়েছে দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাগজপত্র জমা দেওয়া তো হয়ইনি, উপরন্তু চেষ্টা হয়েছে তথ্য গোপনের। এসবই হয়েছে ইউপিএ জমানায়। প্রশ্ন হলো, নাকের ডগায় এত বড়ো জালিয়াতি চলছে সোনিয়া গান্ধী বা মনমোহন সিংহ কী জানতেন না? নাকি অভিযুক্তের নাম প্রণয় রায় বলে তাকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছিল!

এন ডি টিভি-র কর্ণধার প্রণয় রায়।

এন ডি টিভি-র দিল্লি অফিসে সি বি আই তল্লাশি।

মোদী ফেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সারা ভারতের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মোদী সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়াবার লক্ষ্যে একটি 'ক্যুইজ' অনুষ্ঠান চলবে সারা বছর ধরে। লক্ষ্য আগামী লোকসভা নির্বাচনে সরকারের পক্ষে যুব সম্প্রদায়কে আরো বেশি আগ্রহী করে তোলা, নাম দেওয়া হয়েছে মেকিং অব ডেভলপমেন্ট ইন্ডিয়া (মোদী)। এই ক্যুইজ এর মধ্যে দিয়ে মোদী সরকারের তিন বছরের সাফল্যের নানা দিককে আলোকপাত করা হবে। কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া যাক এই প্রসঙ্গে :

(১) বাড়িতে কাঠের উনুনে রান্না হলে দূষণ কী রকম হতে পারে? (২) সারা ভারতের কত ঘরে বিদ্যুতের আলো প্রথম জ্বলেছে মোদী সরকারের আমলে? (৩) স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে ২০১৪-র পর সারা ভারতে কত শৌচালয় বানানো হয়েছে? প্রভৃতি।

এই ক্যুইজ চলবে তিনদিন ধরে ভারতের সব কটি প্রধান শহরে। একটি সূত্র আরো জানাচ্ছে যে বিতর্ক সভা, ব্রেইন গেমও থাকবে। এছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্প যা কিনা যুব সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের অনেক কাজেই আসবে, সেরকম একটি ডিজিটাল প্রদর্শনীও থাকবে। ওই সূত্রটি জানাচ্ছে মোদী সরকারে সাফল্যের তিন বছরের স্লোগান 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'কে কেন্দ্র করে সারা ভারতে উৎসব অনুষ্ঠান করবে বিজেপি, সেখানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী থেকে দলের নেতা-মন্ত্রী সবাই।

উবাচ

"প্যারিস অথবা প্যারিসে-নয়, যাই হোক না কেন, এক স্বচ্ছ ও সুন্দর পৃথিবী থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

প্যারিস পরিবেশ চুক্তি থেকে আমেরিকার বেরিয়ে আসা প্রসঙ্গে।

"এখন বলার সময় হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।"

থেরেসা মে
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

সম্প্রতি লন্ডনে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ প্রসঙ্গে।

"ভারত টাকার লোভে বা অন্য কোনো উন্নত রাষ্ট্রের চাপ বা ভয়ে প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।"

সুষমা স্বরাজ
কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভারত বিরোধী মন্তব্যের প্রসঙ্গে।

"জিএসটি-১৯-এর সফল উৎক্ষেপণের পর অদূর ভবিষ্যতে আরও ভারী যোগাযোগ উপগ্রহ জিএসটি-১১ মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা করবে ইসরো।"

এ এস কিরণকুমার
সভাপতি, ইসরো

মহাকাশে সফল উৎক্ষেপণের প্রসঙ্গে।

"সন্ত্রাস ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য সৌদি আরব কাতার-কে অভিযুক্ত করছে। এটা অনেকটা চালুনির সূচের ফুটো নিয়ে উপহাস করার মতো।"

মেহদি হাসান
ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সাংবাদিক

কাতারের সঙ্গে ছ'টি আরব দেশের সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রসঙ্গে।

কলকাতার সাংবাদিক মহলে এখন প্রবল মমতাভীতি চলছে

গূঢ়পুরুষের কলম

বঙ্গ বিজেপির জনপ্রিয়তা যতই বাড়ছে ততই রাজ্যের দিদিমণির মাথায় রক্তচাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিটলারি কায়দায় হাত-পা-মুখ নেড়ে গ্রামেগঞ্জে সরকারি টাকায় প্রশাসনিক বৈঠকের নামে বিজেপির বাপবাপান্ত করছেন। এটা যে আর্থিক দুর্নীতি দিদিমণিকে সেকথা বলবে কে? প্রশাসনিক বৈঠকে দলীয় রাজনৈতিক প্রচার করাটা সংবিধান বিরোধী। প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রী চাইলে আলাদাভাবে জানাতে পারেন যে প্রশাসনিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটাই সারা ভারতের অন্য সমস্ত রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীরা করেন। দিদিমণিই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁর প্রশাসনিক বৈঠকে অনাহুত, রবাহুত আমজনতা দল বেঁধে উপস্থিত থাকেন। সেখানে পাবলিক সার্ভেন্টদের পাবলিকের সামনে বেইজ্জত করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন যে তিনি পাঠশালার হেড দিদিমণি। মাঝে মধ্যে দলের স্থানীয় নেতাদের মাস্তান আখ্যা দিয়ে জানতে চান তোলাবাজি করে কে কত টাকা পকেটে পুরেছে। দিদিমণি এসব করেন রাজ্যের মানুষকে জানাতে যে তিনিই একমাত্র নেত্রী। বাকি সব ফালতু এলেবেলে লোক।

দিদিমণির একটা মহিমা আমাকে মানতেই হবে। বামফ্রন্ট সরকার তার ৩৪ বছরের শাসনে কলকাতার সাংবাদিকদের পদলেহনকারী পথের কুকুর করতে পারেনি। মমতা তাঁর ছয় বছর শাসনে ৯০ শতাংশ সাংবাদিকদের পা-চাটা উচ্ছিষ্টভোজীতে পরিণত করেছেন। উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। কলকাতার চারটি প্রধান বাংলা দৈনিকের মালিক-পরিচালকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রতিদিন সকালের কাগজে দিদিমণির রঙিন ছবি-সহ তিন কলম হেডিঙের প্রতিবেদন দিতে হবে। রঙিন ছবির ব্যাপারে দিদিমণির ভালরকম দুর্বলতা আছে। সম্প্রতি প্রশাসনিক বৈঠকের নামে দলীয় বৈঠকে তিনি দলের কাউন্সিলার, বিধায়কদের ধমক দিয়ে বলেছেন রাজ্যজুড়ে তাঁর যে কাটআউট (ছবি) ঝুলছে সেখানে দলের প্রতিনিধিদের নাম লেখা থাকছে কেন? তোরা হরিদাস কে? সর্বদা মনে রাখবি দিদি হচ্ছেন শেষ কথা। দিদির ধমকানি-চমকানিতে কলকাতার সাংবাদিকরা কতটা ভীত, আতঙ্কিত তার প্রমাণ কলকাতা প্রেসক্লাবের কর্মসমিতির সাম্প্রতিক নির্বাচন। দিদির নাম ব্যবহার করে রটিয়ে দেওয়া হয় যে তাঁর চোখের মণি দুই সাংবাদিককে প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং সচিব করতে হবে। ওই দুইটি প্রধান পদে অন্য কোনো ক্লাবসদস্য এবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন না। দিদি চাইছেন, তাঁর পছন্দের দুই সাংবাদিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্লাবের সভাপতি ও সচিব হন। কলকাতার সাংবাদিক মহলে এখন প্রবল দিদিভীতির ঝড় বইছে। সেই ঝড় এতটাই তীব্র যে দিদি নিজের মুখে কিছু বলেননি কিন্তু দিদির নাম ব্যবহার করে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে তিনি চাইছেন তাঁর পছন্দের সাংবাদিকরাই কলকাতা প্রেসক্লাবের কর্তা হোক। হ্যাঁ, তাই হয়েছে। কলকাতা প্রেসক্লাবের স্বাধীন চরিত্র আর নেই। রাজপথে সাংবাদিক নিগ্রহের পর মুখ্যমন্ত্রী দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ''গণশক্তির সাংবাদিকদের রাজনীতি করতে বারণ করুন।''।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই অধম কলমচির নিবেদন যে প্রেসক্লাবের ১৫ সদস্যের কর্মসমিতিতে মাত্র একজন গণশক্তির প্রতিনিধি আছেন। গত চার দশকে প্রেসক্লাবের ইতিহাসে কখনও একসঙ্গে দুজন গণশক্তির প্রতিনিধি নির্বাচিত হননি। সুতরাং গণশক্তির সাংবাদিকদের প্ররোচনায় কলকাতায় সাংবাদিকরা বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়েছে এটা মানতে পারছি না। উল্টে বাম রাজত্বে যখন সাংবাদিকরা মার খেয়েছেন তখন প্রেসক্লাবের ধিক্কার মিছিলে গণশক্তির সাংবাদিকরাও যোগ দিয়েছেন। মহাকরণে সাংবাদিকদের 'প্রেস কর্ণার' যখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাইয়ের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হয় তখন প্রতিবাদে যে আন্দোলন হয়েছিল তার বিরোধিতা গণশক্তি কালান্তর ইত্যাদি বামদলের মুখপত্রের সাংবাদিকরা করেননি। কিন্তু এসব কথা দিদিমণিকে বলে লাভ নেই। তবে একটা কথা না বলে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রীর তোষামোদকারী সাংবাদিকরা জেনে রাখুন দিদির প্রয়োজন ফুরোলে তাঁদের কয়েক মিনিটের নোটিশে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়ানো হবে। দিদির রাজনীতিতে কেউ আপন নয়, কেউ পর নয়। যে কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, দিদির বিজেপি-ভীতি। আনন্দবাজার পত্রিকা-সহ আরো তিনটি বাংলা কাগজের তাঁর চামচা পাঁচজন সাংবাদিককে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন প্রতিদিন বিজেপির কুৎসা গাইতে। এদের মধ্যে একজন দিল্লি থেকে লেখেন। অবসরের পরেও তাঁর চাকরি চলছে। কলকাতার জনৈক সাংবাদিক অবসরের পরেও অতি উৎসাহে মমতার মহিমা কীর্তন করে চলেছেন। যতদিন মমতা মুখ্যমন্ত্রী ততদিন তিনি চাকরিতে বহাল থাকবেন। বামফ্রন্ট সরকারের দুই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মিডিয়াকে পায়ের তলায় রাখতে পারেননি। তাঁরা মিডিয়াকে শত্রু বলে মনে করেছেন। মিডিয়াকে যে কেনা যায় তাঁদের জানা ছিল না। মমতার প্রথম দিন থেকেই জানা ছিল। সাংবাদিকদের কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় সে বিদ্যা তাঁর মতো সারাদেশে দ্বিতীয় কোনো রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী জানেন না।

দেশের সর্বকালের সেরা 'সেলসম্যান' নরেন্দ্র মোদী

মাননীয় পাঠক পাঠিকা,

আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। দেশজুড়ে যে মোদী হাওয়া, তাঁর প্রতি আপামর মানুষের যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা তাতে প্রধানমন্ত্রীকে সেলসম্যান বলায় রাগ করবেন না প্লিজ। আসলে আমার মনে হয়, ভারতের এমন একজন সেলসম্যান থাকা খুব জরুরি ছিল। এই ভারতের সব রয়েছে। দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে এতকাল সমস্যা মনে করা হয়েছে। কিন্তু সেটাও যে বিপণন যোগ্য সম্পদ সেটা তিনি বুঝেছেন। এ দেশের প্রকৃতি, পরম্পরা অনেক সম্পদ দিয়েছে কিন্তু তা বিশ্বের দরবারে সেভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সত্যি করেই একজন নেতার দরকার ছিল। সেটা ভারত পেয়েছে। আশাকরি বোঝাতে পেরেছি কেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী আসলে বড় মাপের সেলসম্যান।

বলা হয়, গুজরাটের মানুষেরা ব্যবসা ভালো বোঝেন। সেটা সব সময়ে সত্যি না হলেও দেশের দ্বিতীয় গুজরাটি প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যবসা বোঝেন। বিজেপি বিরোধীরাও এক কথায় তা স্বীকার করবেন। দেশেও নতুন নতুন ভাবনা যে তিনি সফল ভাবে বিকোতে পেরেছেন, তা-ও স্পষ্ট। তাঁর নিজের বিক্রির বাজারও মন্দ নয়। মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান বিক্রি থেকেই এখন অল ইন্ডিয়া রেডিও সর্বাধিক আয় করে।

এতো গেল দেশের কথা। বিদেশের মাটিতেও তিনি সফল সেলসম্যান। তাবলে দেশকে বেচে দেননি তিনি। সম্প্রতি তাঁর বিদেশ সফর নিয়ে নানা প্রশ্নের পাশাপাশি উঠে এসেছে তিন বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির প্রশ্ন। এবার হিসেবটা দিচ্ছি। আশা করি মানবেন তিনি এমন একজন সেলসম্যান যিনি মাত্র তিন বছরে ভারতের সম্মান অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে।

গত তিন বছরে ভারতের 'ম্যাসকট' নরেন্দ্র মোদী ৬০ বার বিদেশে গিয়েছেন। ৩.৪ লক্ষ কিলোমিটার সফর করেছেন। যা পৃথিবীকে আট বারের বেশি প্রদক্ষিণ করার শামিল। কোনোটাই বেড়াতে যাওয়া বা ছুটি কাটাতে যাওয়া নয়। সব ক্ষেত্রেই কূটনীতি আর বাণিজ্য ছিল লক্ষ্য। আরও জেনে রাখুন কত কম খরচে বিদেশ সফর করা যায় তার নজির তৈরি করেছেন মোদী। রাতে সফর মানে এয়ার স্পেসের দাম কম হয়। মোদী তাই করেছেন। বিদেশে হোটেল খরচ কমিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার সময়টা বিমান সফর করেছেন। এমন নজির শুধু ভারতে নয় দুনিয়াতেই নেই।

এবার দেখে নিন সেলসম্যান মোদীর পাঁচটি সাফল্য—

১। ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রথমবার কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট উপস্থিত থেকেছেন নরেন্দ্র মোদীর আমলেই। এবং সেটা প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম বছরেই। এসেছিলেন বারাক ওবামা। এর পরে একের পর এক আমেরিকা সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে ভারতের। দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ সরঞ্জাম বিনিময়ের চুক্তিও হয়েছে।

২। পাক মাটিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরে অনেকেই মনে করেছিলেন এর ফলে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গিয়েছে ঠিক উল্টোটা। পাকিস্তানের দিকেই সবাই আঙুল তুলেছে। এমনকী, বেশ কিছু ইসলামি দেশও।

৩। পাকিস্তানের মাটিতে সার্ক সম্মেলন বয়কট করার ক্ষেত্রেও একই সুবিধা দেখা গিয়েছে। উরিতে ভারতীয় সেনা ছাউনিতে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান একসঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও নতুন করে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে ভারতের।

৪। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, যেমন— আরব আমিরশাহি, কাতার, সৌদি আরব, ইরান, ওমান প্রভৃতি উপসাগরীয় দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন অনেক মজবুত। মোদী আগামী জুলাইতেই যাবেন ইজরায়েল সফরে।

৫। প্রতিটি বিদেশ সফরেই নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি টানতে ক্ষমতায় আসার বছরেই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প নেন মোদী। এই প্রচারে বেশি লক্ষ্য করা হয় ইউরোপকে। আর পরিসংখ্যান বলছে, গত তিন বছরে দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে ১০০ মিলিয়ন ডলার। বৃদ্ধিটা প্রায় ৬২ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, 'সেলসম্যান'-এর মতোই নরেন্দ্র মোদী প্রতিটি বিদেশ সফরেই কথায় কথায় 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া'র প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। নানা ভাবে খবরে থেকেছেন। সেই দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে নিজের এবং দেশের ভাবমূর্তি বিপণনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন ক্ষমতার প্রথম তিন বছরেই। অস্বীকার করার উপায় নেই, নরেন্দ্র মোদীর 'শোম্যানশিপ' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের গরিমাও বাড়িয়েছে।

—সুন্দর মৌলিক

হিন্দু ভাবাবেগ বিজেপিকে জয়যুক্ত করলে সেকুলারিজম ধ্বংস হবে?

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

বেশ কিছুকাল ধরে কিছু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী, স্বার্থান্বেষী নেতা ও আত্মগর্বী সাংবাদিক বিজেপি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে 'মেরুকরণ', 'গৈরিকীকরণ', 'বিভাজন-সৃষ্টি', 'ধর্মান্ধতা', দেশবিভাজনের ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি অভিযোগ তোলা হয়েছে। অথচ এই দল ও তার সঙ্গীরা কেন্দ্রে বারবার ও বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকবার ক্ষমতায় বসলেও ধর্মীয় দিক থেকে কোনো বিভাজন করেনি, একজন সংখ্যালঘু মানুষকেও বিতাড়িত করেনি, বাহুবলে ধর্মান্তরিত করেনি, পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয় জিগির আনেনি বা নতুন করে তাদের কর্মসূচি বা তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। তবুও সংবাদপত্র বা দূরদর্শন খুললেই ওই সব ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও আত্মম্ভরী ব্যক্তিদের কণ্ঠ শুনি বা আগ্নেয় লেখা পড়ি। মনে হয়, ক্ষমতা থাকলে তাঁরা পূর্বোক্ত নেতাদের গর্দান নিতেন বা বনবাসে পাঠাতেন।

বিশেষ করে, পাঁচটা রাজ্য-বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর এই ক্রোধ ও ঘৃণার পরিমাণ একশো গুণ বেড়ে গেছে। এতে মোট ৬৯০ টি আসনের জন্য ভোট হয়েছিল। তাতে বিজেপি ও তার সঙ্গীরা পেয়েছে ৪৩৪টি আসন, কংগ্রেস ১৪০, এসপি ৪৭, বিএসপি ১৯ এবং বামজোট ০। সুতরাং বলা যায়— অন্যান্যরা প্রায় ধুয়ে মুছে গেছে। শুধু পঞ্জাবে কংগ্রেস ৭৭টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে— অন্য চারটে রাজ্যে তার আসন জুটেছে মাত্র ৬৩টি।

উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৩২৫টি, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কিন্তু সমাজবাদী দলের সঙ্গে জোট করে মাত্র ৫৪টি আসন পেয়েছে— তার নিজের আসন মাত্র ০। মণিপুর ও গোয়াতে অবশ্য কংগ্রেস এগিয়ে গেছে যথাক্রমে ২৮ টি ও ১৮টি আসন পেয়ে। বিজেপি মণিপুরে ২১টি এবং গোয়াতে পেয়েছে ১৩ টি আসন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক দল বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছে, কয়েকজন নির্দল বিধায়কও গেছেন তার দিকে— এমনকী মণিপুরে একজন তৃণমূল-বিধায়কও সরকার গঠনে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। তার ফলে ওই দুটো রাজ্যও গেছে তার দখলে। কিন্তু উত্তরাখণ্ডে বিজেপির জয় জয়কার ঘটেছে। ৭০টি আসনের মধ্যে তার ভাগ্যে জুটেছে ৫৭টি আসন, কংগ্রেস সেখানে পেয়েছে মাত্র ১১টি।

এই ফলাফল বিরোধী-নেতা পণ্ডিতমন্য বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের হতাশ, বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। কেউ বলেছেন— ইভিএম মেসিন খারাপ ছিল। কেউ জানিয়েছেন— এই সব রাজ্যে টাকার খেলা চলেছিল। কারও মত বিজেপি হিন্দু তাস খেলেছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন— নরেন্দ্র মোদীকে হটিয়ে ছাড়বেন। মণিপুরে কংগ্রেস মামলা করেছিল কিন্তু তাতে তার মুখই পুড়েছে।

সম্প্রতি সিউড়িতে চৈতন্যদেবের জয়ন্তীর মিছিলকে পুলিশ মাদ্রাসা রোড দিয়ে যেতে দেয়নি। তেমনি, শিবরাত্রিতে ময়ূরেশ্বরের মন্দির ভাঙা হয়েছে। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক্তিয়ারে আছে এই পর্যন্ত ৩৯৯৯টি মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে।... অযোধ্যার রামমন্দির ভেঙে 'বাবরি-মসজিদ' করা হয়েছিল বাবরের আমলে। অথচ তারই ওপরের অংশ কয়েক বছর আগে ভাঙা হলে দেশব্যাপী ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল।

বিজেপি কিন্তু এই সব রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল না যে রিগিং-এর সুযোগ পাবে, ভোটযন্ত্রও তার হাতে ছিল না, টাকা অন্যদের কম নেই। আর উত্তরপ্রদেশে হিন্দু তাস খেলতেও অন্য ধর্মের মানুষ কিন্তু সেখানে কম নেই। আরও বড় কথা হলো— অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই কম্বুকণ্ঠে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন— নরেন্দ্র মোদীর নোট-নীতিই ওই দলকে ডুবিয়ে ছাড়বে। কিন্তু সেটাও ঘটেনি।

আসলে, কোথায় বিজেপির শক্তির উৎসটা রয়েছে— সেটা বোঝার মতো মস্তিষ্ক এই সব বোদ্ধাদের আদৌ নেই। ১৯৮২ সালে প্রথম আবির্ভাবের পর এই দল লোকসভায় নির্বাচনে অংশ নিয়ে মাত্র দুটি আসন পেয়েছিল। সেই দলটাই পরে কেমন করে চারবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছে এবং কয়েকবার কিছু কিছু রাজ্যের মসনদ দখল করেছে— সেটা বুদ্ধি, অনুভূতি ও বিশ্লেষণ শক্তির দ্বারা আবিষ্কার করার দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে এই সব নেতা, বুদ্ধিজীবী ও কিছু সাংবাদিক ক্রোধ ও উষ্মাকেই আশ্রয় করেছেন।

এটা ঠিক যে, বিজেপি হিন্দুত্বের কথা বলে থাকে। কিন্তু কখনও এই দল ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার করেছে? একজন সংখ্যালঘুকেও বিতাড়িত করেছে? স্কুল-কলেজের সিলেবাস বদল করেছে? নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণের আগে বারাণসীতে পুজো দিয়েছিলেন। কিন্তু সেকুলার রাষ্ট্রে নিজের ধর্মকে অনুসরণ করা যাবে না? ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বারাণসীর মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন ও সোমনাথ মন্দির (মুসলমান লুণ্ঠিত) দর্শন করেছিলেন— তাতে

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আসলে, তাঁর মতো মেকি 'প্রগতিশীলরাই' সেকুলার কথাটার অর্থ বোঝেননি। এখনও তাঁর মতো প্রগতিশীলরাই শব্দটার বিকৃত অর্থ তৈরি করে বিভাজন এনেছেন এবং 'ধর্ম'-কথাটার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। ড. এম এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'as Hindu is to-day accepted or secular-only if he is pro-Muslim and perhaps, pro-other minorities'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৯২)। এক মহাবিজ্ঞ পত্রিকা সম্পাদক তাঁর কলমে লিখেছিলেন— 'সেকুলারজিমের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য— 'সেকুলারিজম্' ও 'হিন্দুত্ব' দুটো শব্দের অর্থই তাঁর অজানা।

সেকুলার রাষ্ট্র কোনও ধর্মকেই প্রাধান্য দেয় না এবং কোনও ধর্মাবলম্বীর পক্ষে বা বিপক্ষে থাকে না। ড. এম ভি পাইলী লিখেছেন— 'A secular state...gives protection to all religion equally... —(অ্যান ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১২৪)। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলার নীতি গ্রহণ করেছে বলে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে?

আচ্ছা, 'হিন্দুত্ব' কথাটার অর্থ কি? 'হিন্দু' শব্দটা শুধু একটা ধর্মকে বোঝায় না— এর একটা জাতিগত ও দার্শনিক দিকও আছে। সুপ্রিম কোর্টের মতে— এটা একটা জীবন দর্শন-ও ('way of life') বোঝায়। রামশরণ শর্মা জানিয়েছেন, আর্যরা সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন— বিদেশীরা 'সিন্ধু' থেকে 'হিন্দু' কথাটা উচ্চারণ করতেন— গ্রীক 'ইন্ডিয়া' ও আরবী ও পার্শী ভাষায় এটা হয়েছে 'হিন্দ' বা হিন্দু (প্রাচীন ভারত, পৃ. ২)। অনুরূপভাবে ড. ঊষারঞ্জন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন— একটা জাতিসত্তা গঠিত হয়েছিল সিন্ধুর তীরে তারই নাম 'হিন্দু'। তাই ভারতের অন্য নাম 'হিন্দুস্থান', পর্বতের নাম 'হিন্দুকুশ', রাষ্ট্রীয় চেতনার নাম 'জয় হিন্দ'— (প্রসঙ্গ গণতন্ত্র, রাজনীতি ও ধর্ম, পৃ. ৩৯)। এই হিন্দু ঐতিহ্য ও ধর্মই শিখিয়েছে— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' (সবাই আত্মীয়), 'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ/ সর্বে সন্ত নিরাময়ঃ।' (সবাই সুখে থাকুন/সবাই সুস্থ থাকুন)/ 'সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু/(সবাই ভালটা দেখুন)/ মা কশ্চিৎ দুঃখ-আপ্নুয়াৎ (কারও যেন দুঃখ না হয়)। এক্ষেত্রে 'সবাই' কথাটা শুধু মানুষকে নয়— জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গকেও বোঝানো হয়েছে।

এর মধ্যে ধর্মবিদ্বেষ কোথায়? বিজেপি কাউকে 'হিন্দু' হতে বলছে? বলেছে— 'ভারতীয়' হওয়ার জন্য— একটা অখণ্ড ভারত-বোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা তাঁদের পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে চেয়েছেন ঐকান্তিকভাবে। ড. জে সি জোহারী মন্তব্য করেছেন, 'The orthodox school of the Muslim Community makes out a pawcrobus case againest nationalism, secularism and democresy— (ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ২৮০)।

রামকৃষ্ণদেব আমাদের শিখিয়েছেন সব ধর্ম একই দিকে নিয়ে যায়— 'যত মত, তত পথ।' আর স্বামীজী চিকাগোতে শেষ ভাষণে বলেছেন— দরকার প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; বিভেদ নয়— ঐক্য।

কিন্তু পূর্বোক্ত সম্প্রদায় চেয়েছে— পৃথক অস্তিত্ব, বাড়তি সুযোগ। তাই সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে সবারই জন্য অভিন্ন দেওয়ানী আইন রচনার নির্দেশ দিলেও তাঁদের বাধায় সেটা আজও হয়নি। আমেদ খাঁ বনাম শাহবানোর মামলায় (১৯৮৫) প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এটাকে 'matter of regret' বলে মন্তব্য করেছিলেন। আর সেই বছরই ডিয়েঙ্গডে বনাম ডোপ্রার মামলায় সর্বোচ্চ আদালত সরকারকে কাজটা সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। সরলা মুদ্গল বনাম ভারত-সরকারের মামলায় (১৯৯৫) বিচারপতি কুলদীপ সিং লিখেছিলেন— 'When more than 80% of the citizens have already been brought under the personal law, there is no reason whatsover to keep in abayance any more, the introduction of uniform civil code।

কিন্তু এখনও সেটা করা যায়নি এই ধর্মাবলম্বীদের বাধার ফলে। বরং ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী আদালতের রায়কে অতিক্রম করার জন্য নতুন আইন রচনা করেছিলেন। অথচ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরাক, মিশর ইত্যাদি মুসলমান অধ্যুষিত দেশ শরীয়ত আইন সংশোধন করেছে, রচিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় বিধি। কিন্তু এই দেশের গোঁড়া মুসলমানরা বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে চেয়েছেন শরীয়তী আইন। সম্প্রতি 'পার্সনাল ল' বোর্ড' জানিয়েছে— সেই আইনের বৈধতা বিচারের অধিকার সুপ্রিম কোর্টেরও নেই— বরং এর জন্য সংবিধান সংশোধন করা দরকার।

এই ব্যাপারে প্রগতিশীলরা নীরব কেন? শুধু তাই নয়। সম্প্রতি সিউড়িতে চৈতন্যদেবের জয়ন্তীর মিছিলকে পুলিশ মাদ্রাসা রোড দিয়ে যেতে দেয়নি। তেমনি, শিবরাত্রিতে ময়ূরেশ্বরের মন্দির ভাঙা হয়েছে। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক্তিয়ারে আছে এই পর্যন্ত ৩৯৯৯টি মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী— (ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯) এবং কে এস লাল (মুসলিম স্টেট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৫৬) জানিয়েছেন, অযোধ্যার রামমন্দির ভেঙে 'বাবরি-মসজিদ' করা হয়েছিল বাবরের আমলে। অথচ তারই ওপরের অংশ কয়েক বছর আগে ভাঙা হলে দেশব্যাপী ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল। বিজেপি শাসিত চারটে রাজ্যকে আনা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসনে।

আচার্য নন্দলাল বসু মাতা সরস্বতীর দুটো ছবি এঁকেছেন দেখে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মন আপ্লুত হয়। কিন্তু মকবুল ফিদা হুসেন তাঁর নগ্নমূর্তি আঁকলেন, অন্য একটা ছবিতে দেখালেন (লিখতে লজ্জা হয়)— মাতা সীতা হনুমানের কোলে— তার ল্যাজ ঢুকেছে সীতা মায়ের গোপনাঙ্গে। প্রগতিশীলরা তখন কোথায় ছিলেন? হিন্দু সেন্টিমেন্ট্ এবার যদি বিজেপিকে জয়যুক্ত করে, তাহলে সেকুলারিজম্ ধ্বংস হবে?

(লেখক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার তৃণমূলী কৌশল গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক

অভিমন্যু গুহ

গণতন্ত্র হত্যার সাক্ষী পশ্চিমবঙ্গ গত কয়েক দশক ধরেই হচ্ছে। ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সারা দেশে গণতন্ত্র ভূ-লুণ্ঠনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে এই ব্যবস্থা ছিল বছর দুয়েকের। তারপরের চল্লিশ বছরে সারা দেশেই কোনো না কোনো সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে কিন্তু ব্যতিক্রম থেকে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে এ রাজ্যে গণতন্ত্রের অবস্থাটা ছিল বিচিত্র। তখন তো আর ইভিএম আসেনি, অন্তত বাম শাসনের প্রথম আড়াই দশকে। বুলেট দেখিয়ে ব্যালটে ভোট হোত, বলা বাহুল্য কোনো বুথে হাজার খানেক ভোটার থাকলে ভোট পড়তো বারোশো'র কাছাকাছি। এজেন্টশূন্য বুথে বিরোধীদের কপালে চার পাঁচটা সান্ত্বনা ভোট জুটতো, বাকিগুলি সর্বহারা দলের প্রার্থীই পেতেন। এধরনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাংলায় বাম আমলে ছিল। এই ভুতুড়ে ভোটারদের ভোটদান প্রক্রিয়া সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত 'বৈজ্ঞানিক রিগিং' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই ভাতে ঘি মেখে খাওয়ার দিন তো বামেদের কবেই ফুরিয়েছে। কিন্তু নস্ট্যালজিয়া আর যায় কই? তাই দাও ফিরে সে ব্যালট, লও এ ইভিএম বলে নির্বাচন কমিশনে এক পা এগোয়, আর তিন পা পেছোয়।

প্রায় চৌত্রিশ বছরের বাম জমানা পেরিয়ে, ছয় বছরের তৃণমূলি জমানায় বাংলায় গণতন্ত্রের হাল আরও শোচনীয় এবং বিপজ্জনকভাবে শোচনীয়। শুরুটা অবশ্য সিপিএম-ই করেছিল, কিন্তু সিপিএমের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী গুরুকে

রীতিমত টেক্কা দিয়েছেন। বাম আমলে বিরোধী দলে নিজেদের এজেন্ট তৈরির কাজটা সিপিএম প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৭ সালে এদের জন্যই মমতা ব্যানার্জীকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল এবং এদেরকে তিনি 'তরমুজ' আখ্যা দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই তরমুজেরাই আজ শাসক মমতার কাছের লোক। যাইহোক, এই তরমুজদের জন্যই ইভিএম প্রক্রিয়ার নির্বাচনকে রীতিমতো গণতান্ত্রিক প্রহসনে পরিণত করেছিল সিপিএম। ২০০১ সালে বামেদের যখন যায় যায় অবস্থা তখন কংগ্রেসের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এনডিএ ত্যাগ করে তাঁর ছেড়ে আসা তরমুজ দলের হাত ধরে ষষ্ঠবারের জন্য বামেদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করেছিলেন মমতা। আর তারপর সিপিএম তাদের বিরোধীদের নিকেশ করার খেল দেখিয়েছিল।

একে তখন তো মমতা এন ডি এ-র সঙ্গ ছাড়ায় নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। পরে এনডিএ-র হাত ধরলেও সিপিএমের এজেন্টরা নানা ধরনের উৎপাত শুরু করল। মনে থাকতে পারে ২০০৪ সালে উত্তর-পশ্চিম কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রায় জেতা আসন হাতছাড়া হয়েছিল মমতা বর্ণিত এক 'তরমুজে'র জন্যই। সেই 'তরমুজ'টি তখন কলকাতার মেয়র, তবুও তিনি আজকের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে লোকসভায় প্রার্থী হলেন সেখানকার জয়ী প্রার্থীকে টপকে। ফলে এদের দ্বৈরথে মাঝখান থেকে সাতাত্তরের পর যা কোনোদিন হয়নি, ঠিক তাই হলো; সিপিএম জিতে গেল কলকাতার উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে। ঠিক এর পরের বছরই ওই 'তরমুজ' ভদ্রলোকটি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে গিয়ে সিপিএমের হাতে কলকাতার পুরবোর্ড তুলে দিয়েছিলেন। গণতন্ত্রকে কীভাবে কালিমালিপ্ত করা যায় সিপিএম পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তার বিস্তর নমুনা দেখিয়েছিল।

যদিও সিপিএমের এই শৈল্পিক গণতন্ত্র লুণ্ঠনের তুলনায় আজকের তৃণমূলের গণতন্ত্র হত্যাকে একেবারেই পাতে দেওয়া যায় না কিন্তু প্রবণতাটি আরও বিপজ্জনক। সিপিএমের মেধাবী ছাত্রীটি সার বুঝে গিয়েছেন ওসব বিরোধী দলে এজেন্ট তৈরি করে ঝামেলা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। তাতে অনেক হ্যাপা। তার চাইতে সব্বাইকে নিজের দলের ছাতায় আনা অনেক ভালো। তাঁর উন্নয়নের হড়পা বানে বিরোধী একেবারে নিশ্চিহ্ন! বাম আমলের মতোই তৃণমূলের জমানাতেও হুমকি, ধমকি, রিগিং, হাত কেটে নেওয়া, পা কেটে নেওয়া ইত্যাদি ট্র্যাডিশনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু যে পরিবর্তনটা চোখে লাগছে সেটা হলো এই হুমকি, ধমকি, অত্যাচারের ফাঁক গলে যে দু' একজন বেরিয়ে পড়ছেন অর্থাৎ ভোটে

জিতে যাচ্ছেন, তাঁরা হঠাৎ জেতার পরে উন্নয়নের 'বিবেকের ডাক' শুনতে পাচ্ছেন এবং সেই উন্নয়নে শামিল হতে গিয়ে তৃণমূলে নাম লেখাচ্ছেন। বাম আমলে গণতন্ত্র ধ্বংসে উন্নয়নের এই হিড়িক অবশ্যই ছিল না।

ভারতবর্ষে দলত্যাগ বিরোধী আইন বলে একটা বস্তু রয়েছে। ১৯৮৫ সালে যা গৃহীত হয়েছিল, ২০০৩ সালে যা সংশোধিত হয়। দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী কোনো জনপ্রতিনিধি তাঁর দলীয় সদস্যপদ ত্যাগ করলে কিংবা আস্থা ভোটের সময় পার্টির হুইপ অমান্য করলে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় তাঁর মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাঁকে পুনরায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। যদি দলই তাঁকে বহিষ্কার করে সেক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম খাটবে না। অর্থাৎ তখন তাঁর জনপ্রতিনিধি হিসেবে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় অংশ নিতে আর বাধা থাকবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় দল অবাধ্য জনপ্রতিনিধিকে সবক শেখাতে সরাসরি বহিষ্কারের রাস্তায় না গিয়ে, সাসপেন্ডের পথ নেয়। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিটির অন্য দলে যাওয়ার উপায় থাকে না, যদিও গণতান্ত্রিক পদটি বহাল থাকে, খানিকটা নিষ্ক্রিয় ভাবেই।

দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী কোনো দলের ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশ বিধায়ক একসঙ্গে দলত্যাগ করে অন্য দলে গেলে ওপরের কোনো নিয়মই খাটবে না। এক্ষেত্রে এঁদের দলবদল গ্রাহ্য হবে এবং পুনরায় নির্বাচনের মধ্যে না গিয়েও এঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে বহাল থাকবেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে তফাত হলো— সিপিএম গণতন্ত্র-বিরোধী দল কিন্তু তৃণমূল অগণতান্ত্রিক দল। আর এই গণতন্ত্র-বিরোধীদের হঠিয়ে অগণতান্ত্রিক দলের পাল্লায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্রমশ অবলুপ্তির পথে।

দল ভাঙানো ভারতবর্ষে নতুন কিছু নয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গেলে দলবদলের সাংবিধানিক স্বীকৃতিও রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে যে 'কংগ্রেসী' ব্যক্তিটি 'কমরেড' সম্বোধনে আপ্লুত হলেন, কমরেড মিশ্রকে তাঁর নেতা বলে ঘোষণা করলেন; নির্বাচনের ফল বেরোলে দেখা গেল বিধানসভায় 'পাবলিক অ্যাকাউন্টস' কমিটির চেয়ারম্যান পদ আঁকড়ে থাকার জন্য তিনি নিমেষে কংগ্রেস থেকে 'তৃণমূলি' হয়ে গেলেন। যদিও দলত্যাগ বিরোধী আইনের গেরোয় তৃণমূলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'কংগ্রেসী' পরিচয় দিতে তাঁর বাধেনি। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে যেদিন সদম্ভে তিনি নিজেকে কংগ্রেসেই আছি বলে ঘোষণা করলেন, সেদিনই তৃণমূল তাঁকে দলে আসার পুরস্কার দিয়ে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে দিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এখনও জনাকয়েক 'তৃণমূলি' বিধায়কের দেখা মিলবে, যারা কংগ্রেস ও সিপিএমের টিকিটে নির্বাচন জিতেছে কিন্তু দলত্যাগ আইনের তোয়াক্কা না করে এখনও স্বপদে বহাল। সুতরাং এই ধরনের দলত্যাগের পেছনে দলত্যাগীর ব্যক্তিগত লোভ-লালসা যেমন কাজ করে, তেমনি শাসক দলের গণতান্ত্রিকতা বিরোধী সর্বগ্রাসী মানসিকতাও কাজ করে।

এই মানসিকতা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে রাজ্যের পুরসভা বা পঞ্চায়েতগুলির ক্ষেত্রে। বাম আমলেও পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে বিরোধী শূন্য করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেনি যে দু-একজন বিরোধী যাঁরা কোনোক্রমে তৃণমূলিদের অত্যাচার সামলে জিতেছেন, তাঁরাও জেতার পরে শাসকদলে যোগ দেবেন, রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার আনার অজুহাতে। এর পেছনে ওই প্রার্থীদের প্রলোভন বা লোভের থেকেও ঢের কাজ করে তৃণমূলের শাসানি ও ভীতিপ্রদর্শন। দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার পূজালি পুরসভার দুই জয়ী বিজেপি প্রার্থীকে কব্জা করার ক্ষেত্রে এই ঘটনা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়েছে। এর ফলে গণতন্ত্র কতটা কলুষিত হয় তার নমুনা মুর্শিদাবাদ জেলা। একদা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর গড়। ভোটে কোনোদিন তাঁকে বা তাঁর প্রার্থীদের হারাতে পারেনি তৃণমূল। কিন্তু মুর্শিদাবাদের পুরসভাগুলিতে কংগ্রেসকে আজ দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাকালে অনেকেই হয়তো বিজেপি-র দিকে আঙুল তুলবেন। বিশেষ করে মণিপুরে তৃণমূলের একমাত্র বিধায়কের বিজেপিতে যোগদান কিংবা গোয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের সরকার গড়তে না পারা ইত্যাদি ব্যাপারে। কিন্তু এও ঠিক উত্তর-পূর্বের রাজনৈতিক চরিত্রই হলো ক্ষমতাসীনদের দিকে থাকা। মণিপুরে ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছতে বিজেপি-র যে দু-একজন বিধায়কের সমর্থন দরকার ছিল বাইরে থেকে, তৃণমূলের বিধায়ক সেই সমর্থনটুকু দিয়েছিলেন মাত্র। তিনি তৃণমূলের একমাত্র বিধায়ক মণিপুরে, তাই তাঁর ক্ষেত্রে দলীয় হুইপের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের লোভে তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপিকে সমর্থনের বিষয়টি মানতে নারাজ ছিলেন বলেই মণিপুরের তৃণমূল-বিধায়ককে বিজেপিতে নাম লেখাতে হয়েছিল। তিনি বিজেপিকে সমর্থন না করলে মণিপুর বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হোত, রাজ্যের প্রগতি থমকে যেত যা মোটেই কাম্য ছিল না। গোয়ায় দলবদল হয়নি, সংবিধানের আওতায় শরিকি সমর্থনে সরকার গঠন করতে পেরেছে। কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকলে তার দায় নিশ্চয়ই বিজেপির নয়।

কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত কি ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে নিরঙ্কুশ জয়ের পরও বিরোধীদের ছিটেফোঁটা আসনের দিকেও হাত বাড়াচ্ছে বিজেপি? গণতান্ত্রিক কাঠামোকে এইভাবে বিরোধীশূন্য করার কৌশল এখন কেবল তৃণমূলই একেচেটিয়াভাবে আয়ত্ত করেছে। প্রশ্নটা সেখানেই। পুরসভাগুলির হাল ত্রিশঙ্কু হলে সেখানে ক্ষমতা দখলের জন্য সংবিধানের আওতার মধ্যে তৃণমূল পদক্ষেপ করলে বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের পরও একটাও বিরোধী থাকতে দেব না, তাদের হাতেও তৃণমূলের ঝান্ডা ওড়াবো— এই মানসিকতা বিপজ্জনক। বাম আমলে বাংলার মানুষ উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের 'সিপিএমের দলদাস' হতে দেখেছে, এখন 'বৃহত্তর তৃণমূল পরিবারে'র (নেত্রী উবাচ) অংশ হতে দেখছে। এই আমাদের চল্লিশ পেরোন অগণতন্ত্র। ■

দেশে গোহত্যা বন্ধের জন্য কেন্দ্রের নোটিফিকেশন কার্যকর হওয়া উচিত

ধর্মানন্দ দেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ ঊনবিংশ খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— 'একজন বাড়িতে শ্রাদ্ধ করছিল। অনেক লোকজন খাচ্ছিল। একটা কসাই গোরু নিয়ে যাচ্ছে কাটবে বলে। গোরু বাগ মানছিল না, কসাই হাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন সে ভাবল শ্রাদ্ধবাড়ি গিয়ে খাই। খেয়ে গায়ে জোর করি, তারপর গোরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই করে, কিন্তু যখন সে গোরু কাটলো তখন যে শ্রাদ্ধ করেছিল, তারও গোহত্যার পাপ হলো।' শ্রীরামকৃষ্ণের উক্ত বক্তব্য থেকে পাওয়া যায় গোহত্যা একটি অত্যন্ত পাপ কাজ। গোহত্যাকারীকে কোনোভাবে সেবা সহযোগিতা সমর্থন করলেও পাপ হয়। সম্পূর্ণ অজান্তে কসাইয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার কারণে যদি পাপ লাগে, তাহলে সজ্ঞানে যারা গোহত্যা করছে, গোমাংস ভক্ষণ করেছে, তারা কতটা পাপী। পাপী মানে অন্যায় অযৌক্তিক অকল্যাণকর কার্যদোষী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 'সঙ্ঘ পরিবারের' লোক ছিলেন কিনা সেটা কিন্তু অনুসন্ধানের দায়িত্ব এই ভারতবিরোধী-বিশ্বপ্রেমী আঁতেলদের এবং গোভক্ষক বা তাদের সমর্থনকারীদের।

আমাদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে আহার স্বাধীনতা। তাই কোনো দল, সংগঠন বা সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সম্প্রতি কিছু লোক বলে বেড়াচ্ছেন— 'কে কী খাবে, অপরে ঠিক করে দেবে কেন?' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের ইচ্ছে করলেই কী কচ্ছপ খাওয়া যায়? উত্তর হচ্ছে--- না। কচ্ছপ ধরা-বেচা-কাটা-কেনা-খাওয়া সব নিষিদ্ধ। কে নিষিদ্ধ করেছে? তৎকালীন ভারত সরকার। আর বর্তমান মোদী সরকার কী করেছে? সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ পালন করেছে। গৌরী মৌলেখি একটি মামলা দায়ের করেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। যার নম্বর ৮৮১/২০১৪ রিট পিটিশন (সিভিল)। সুপ্রিমকোর্ট ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই পশু সুরক্ষার জন্য পরামর্শ প্রদান করে এবং এক কমিটিও তৈরি করে দেয়। ওই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সশস্ত্র সীমা বলের ডিরেক্টর জেনারেল। এছাড়াও ১২ জুলাই ২০১৬ সালে সুপ্রিমকোর্ট ওই মামলায় চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে এবং কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করে জানায় যে ১৯৬০ সালে প্রিভেনশন অব ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস আইনের ৩৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী রুলস তৈরি করার জন্য। সুপ্রিমকোর্টের সব পরামর্শ মেনে কেন্দ্রের পশুকল্যাণ বোর্ড দু'টি খসড়া রুলস তৈরি করে।

রুলসগুলি হচ্ছে Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules, ২০১৭ এবং Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules 2017. ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ সালে সেটি জনসম্মুখে প্রকাশ করে। আমজনতার পরামর্শ ও আপত্তি এক মাসের ভিতর দাখিল করার অনুরোধ জানায় কেন্দ্র সরকার এবং মাত্র ১৩টি আবেদন কেন্দ্র সরকার পায়। পরে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রক ১৯৬০ সালে প্রিভেনশন অব ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস্ আইনের ৩৮ নম্বর ধারার ১ ও ২ উপধারায় Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules, 2017 এবং Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2017 নামের দুটি রুলস তৈরি করে। প্রথম রুলসে ২৭টি ধারা রয়েছে এবং দ্বিতীয় রুলসে ৮টি ধারা রয়েছে।

এখন আমরা Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules, 2017 নিয়ে কিছুটা আলোচনা করে নিই। নতুন রুলস মতে কৃষিকাজের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে পশু বিক্রি করা যাবে না। পশুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রুলসে বলা হয়েছে গোরু, ষাঁড়, গাড়ি টানা বলদ, হাল টানা বলদ, মোষ, বকনা বাছুর এবং উট হলো পশু। ওই রুলসের ৩ নম্বর ধারা মতে দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা পশুবাজার মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটি গঠন করবেন রাজ্য বোর্ডের পরামর্শ নিয়ে জেলা উপায়ুক্ত। জেলা উপায়ুক্ত হবেন জেলা কমিটির অধ্যক্ষ। সচিব হিসেবে

থাকবেন মুখ্য পশু অফিসার, সদস্য হিসেবে থাকবেন ডিভিশনাল বন আধিকারিক, পুলিশ অধিক্ষক, দুজন পশুকল্যাণ সংস্থার সদস্য, সভায় উপস্থিত সদস্য থেকে নেওয়া হবে চারজনকে। ওই কমিটি নতুন পশুবাজার স্থাপনের সমস্ত ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে পারবে। অবশ্য সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো পশুবাজার থাকতে পারবে না। দু'টি রাজ্যের সীমানার ২৫ কিলোমিটার দূরে করতে হবে পশুবাজার। এই রুলস যদি পশুবাজার না মেনে চলে তবে মনিটরিং কমিটি পশুবাজারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারবে। পশু কেনাবেচার জন্য নথির প্রয়োজন হবে। পশুবাজারে পশু আনার পরেই একটি লিখিত ঘোষণাপত্র পশুর মালিক বা তার নিযুক্ত এজেন্টকে দিতে হবে। সঙ্গে ফটো-সহ পরিচয়পত্র দিতে হবে। পশুবাজার কমিটি কমপক্ষে ৬ মাস সেটা যত্নসহকারে রাখবে। ক্রেতাকেও ঘোষণা করতে হবে যে পশুহত্যার জন্য পশু নেওয়া হচ্ছে না। পশুবাজারে পশু বিক্রির পর বিক্রির প্রমাণপত্র পাঁচ কপি দেওয়া হবে। তারমধ্যে প্রথম কপি ক্রেতার কাছে দেওয়া হবে, দ্বিতীয় কপি বিক্রেতাকে, তৃতীয় কপি ক্রেতার তহশিল কার্যালয়ে দেওয়া হবে, চতুর্থ কপি জেলার মুখ্য পশু আধিকারিককে দেওয়া হবে এবং পঞ্চম তথা শেষ কপি থাকবে পশুবাজার কমিটির কাছে। অসুস্থ ও রুগ্ন পশু বাজারে বিক্রি করা যাবে না। আগামী তিন মাসের মধ্যে উভয় নোটিফিকেশন সমগ্র দেশে কার্যকর করে তুলতে হবে। এইটুকু আলোচনা থেকেই বলা যায় দেশ জুড়ে অবাধে গোহত্যা, খোলাবাজারে অবাধে গোরু বিক্রি আর করা যাবে না। শুধুমাত্র চাষের কাজে গোরু বিক্রি করা যাবে তাও প্রমাণস্বাপেক্ষ এবং অসুস্থ ও রুগ্ন গোরু বাদ দিয়ে। অন্যদিকে Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2017 মতে কোনো পশু জখম হলে বিচারক সেটাকে গোশালা বা পশু কল্যাণমূলক কোনো সংস্থাকে দায়িত্ব দেবেন। দেখভালের জন্য প্রতিদিনের খরচ আইনমোতাবেক বা বিচারকের নির্দেশ মতে শর্তসাপেক্ষে রাজ্য বোর্ড তা বহন করবে। এখন যাদের বৈধ কাগজপত্র আছে একমাত্র তাঁরাই গবাদি পশু বিক্রি করতে পারবেন। আর ওই গবাদি পশু একমাত্র কৃষিকাজেই ব্যবহার করা যাবে। কোরবানি দেওয়ার জন্য অথবা মাংস খাওয়ার জন্য এখন আর গোরু, মোষ, ষাঁড়, বলদ, বাছুরের মতো পশু বাজারে বিক্রি করা যাবে না। তবে ছাগল ও ভেড়া এই দুটি রুলসের আওতায় নেই। আমরা জানি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গোমাংস বিরোধী আইন অর্থাৎ গোহত্যা বা গোমাংস বিক্রি সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ বা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। তাই মোদী সরকারের নতুন দু'টি নোটিফিকেশন কার্যকর হলে সমগ্র দেশে গোহত্যা বন্ধ পুরোপুরি না হলেও কমবে।

তবে এটা ঠিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতি গো-আধারিত। গো-সংরক্ষণ ও গো-সংবর্ধন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান স্তম্ভ। গো-সম্পদ বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। শুধু মানুষ নয়, অন্য সমস্ত জীব-গাছ পালা-মাটি-জল-আকাশ-বাতাস সবকিছুই গোরুর দ্বারা লাভান্বিত। মোদ্দা কথা হলো, গোরু বাঁচলে বিশ্ব বাঁচবে। কেননা মানুষের শরীরে যত রাসায়নিক পদার্থ আছে তার সবকটি আছে গোমূত্রে। গোমূত্রের দ্বারা শতাধিক সাধারণ ও কঠিন রোগের চিকিৎসা হচ্ছে। গোবর শুধু ভূমিসারই নয়, মানুষের কঠিন রোগে অত্যন্ত লাভদায়ক। সাম্প্রতিক উরুগুয়ের আর্থিক বিকাশে গোরুর অবদান থেকেও আমাদের কিছুটা শিক্ষা নেওয়া উচিত। গোরুর উপকারিতা সবিস্তারে লিখতে হলে আরেকটি রচনা হয়ে যাবে। সংখ্যালঘুদের কি কর্তব্য-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, গোহত্যা না করা? শুধু আহার স্বাধীনতার জন্য গোহত্যা করে গোমাংস দিনের পর দিন খেয়ে যাবে, আর সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সেই খাওয়ার দৃশ্যও পরিবেশন করবে। রাস্তায় যখন মানুষ গাড়ি করে যাবে তখন দেখবে তারই সংস্কৃতির পতন হচ্ছে রাস্তার পাশে। তাই গোহত্যা বন্ধ হওয়া শীঘ্রই উচিত। আর যারা হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করে অন্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এই সমাজের বুকে বসেই হিন্দুর ধর্ম ও সমাজের উপর নির্মমভাবে নিন্দা, গালি, বাক্যবাণ বর্ষণপূর্বক তার অঙ্গচ্ছেদ করবে, তারপরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা চুপ করে বসে থাকবে। এটাই কি অসহিষ্ণুতা! পরিশেষে বলব, সব অপপ্রচার, অপপ্রয়াস, অপচেষ্টা ও অপসংস্কৃতি বন্ধ করে সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য ভারতে বিফ পার্টি না করে মিল্ক পার্টির আয়োজন করা হোক। আশা করা যায় পশু বিক্রি নিয়ে জারি করা মোদী সরকারের দু'টি নোটিফিকেশন সমগ্র দেশে লাগু হলে আপনা থেকেই গোহত্যা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই নোটিফিকেশন দু'টি শীঘ্রই কার্যকর হওয়া উচিত এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কসাইখানায় পশুর নথি পরীক্ষা অবিলম্বে শুরু হওয়া উচিত।

(লেখক একজন আইনজীবী)

With Best Compliments from-

A

Well

Wisher

(BSI)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

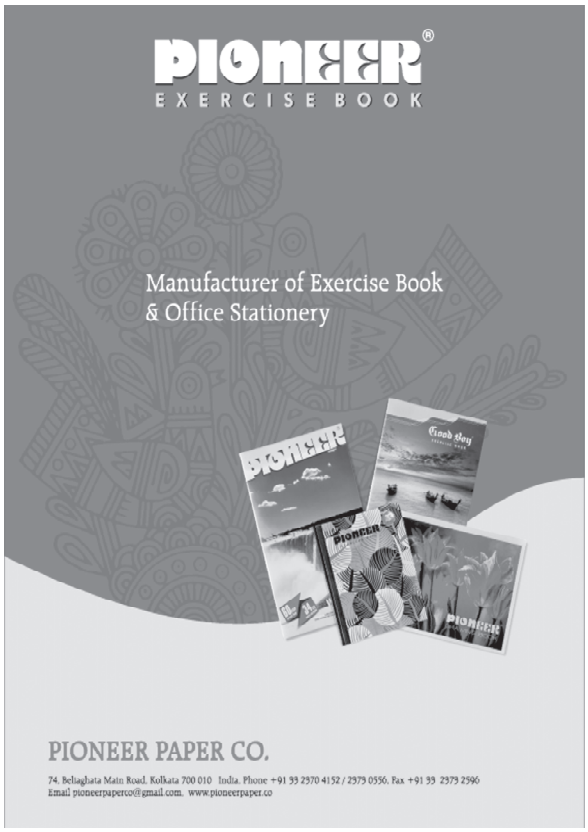

"তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র তাই নয়, অতীত ও ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক— যদি যথার্থই অভিন্ন সত্তা হয়, তবে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি— সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্য উপলব্ধির পন্থা। অতএব আধ্যাত্মিক ও লৌকিক— এই ভেদ আর থাকতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা, জয় করার অর্থ ত্যাগ, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্যে পরিণত। যোগ ও মোক্ষ— ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ব্রহ্মাবর্ত
দশ হাজার বছরের বৈদিক সভ্যতার পীঠস্থান

সন্দীপ চক্রবর্তী

সরস্বতীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন ইতিমধ্যেই পুরাতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন। এখন প্রয়োজন, বেদ-উপনিষদ ভারতের যেখানে লেখা হয়েছিল সেই অঞ্চলটিকে খুঁজে বের করা। সরস্বতীর উৎস সন্ধানে পুরাতাত্ত্বিক অভিযান এবং পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হরপ্পা সভ্যতার নানাবিধ নিদর্শন আবিষ্কার ভারতের ইতিহাসচর্চার নিরিখে যথেষ্টই ভালো লক্ষণ। কারণ তাতে এইটুকু অন্তত প্রমাণ করা গেছে যে সরস্বতীর অস্তিত্ব কোনো কষ্টকল্পনা নয়। এবং ভারতের যেসব প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সরস্বতীর কথা রয়েছে সেগুলিও পৌরাণিক গালগল্প নয়।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভে সরস্বতী নদীর অববাহিকায় অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (বা দেশ) ছিল ব্রহ্মাবর্ত। সর্বশেষ হিমযুগের পর যে মহাপ্লাবন হয়েছিল, তারপর লিখিত মনুস্মৃতি অনুযায়ী',... দশ হাজার বছর আগে দেবতারা সরস্বতী এবং দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্রহ্মাবর্তের পত্তন করেছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত ছিল ব্রাহ্মণদের দেশ।' (মনুস্মৃতি : তুলসী রামস্বামী, পৃ. ৭৪)। এরপর থেকে যে-সব রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এই অঞ্চলের মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেনে এলেন, তা-ই কালক্রমে হয়ে উঠল শ্রেষ্ঠ। এক কথায় বললে বলতে হয়, 'ব্রহ্মাবর্তের মানুষের আচার-ব্যবহারই ছিল ভালো মানুষের আচার-ব্যবহার।' (ম্লেচ্ছস, যবনস অ্যান্ড হিদেনস : ইন্টারঅ্যাক্টিং জেনোলজিস ইন আরলি নাইনটিনথ-সেনচুরি ক্যালকাটা, পৃ. ১২৫)

মনুস্মৃতি এও বলে, ব্রহ্মাবর্ত ছিল শুধুমাত্র ভালো মানুষদের জন্মভূমি। অর্থাৎ মানুষের ভালত্ব তার আচার-আচরণের ওপর নির্ভর করে ঠিকই কিন্তু তার আচার-আচরণ কেমন হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে জন্মসূত্রে অর্জিত মূল্যবোধের ওপর। এখানেই বেড়ে যায় জন্মস্থানের মাহাত্ম্য। ব্রহ্মাবর্ত কথাটির অর্থ নানাজনে নানাভাবে করেছেন। কেউ বলেছেন ব্রহ্মাবর্ত মানে, 'দেবভূমি' বা 'পবিত্রভূমি' (সরস্বতী রিভার লস্ট ইন এ ডেজার্ট : এ.ভি. শঙ্করণ, পৃ. ৪)। ঋগ্বেদের অভিমত, ব্রহ্মাবর্ত হলো 'দেবতার আবাসভূমি' এবং 'সমগ্র সৃষ্টির কারণ স্বরূপ'। আধুনিক যুগের ভারততত্ত্ববিদেরাও মানেন যে ব্রহ্মাবর্তের এমনকিছু বিশেষ গুণ ছিল যা তৎকালীন অন্য কোনো ভৌগোলিক ক্ষেত্রের ছিল না।

আমাদের দেশে বৈদিক যুগকে মাত্র ২৫০০-৩০০০ বছরের পুরনো বলে দেখানো হয়। মনুস্মৃতিকে বলা হয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রচনা। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বস্তুত, মনু এবং মহর্ষি ভৃগু ছিলেন মহাপ্লাবনের সমসাময়িক মানুষ। অর্থাৎ দশ হাজার বছর আগে তাঁরা জীবিত ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বা সনাতন ধর্মের সূত্রপাত তারও বহু আগে।

মহাপ্লাবনের অব্যবহিত পরেই, ভারতবর্ষের জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন ব্রহ্মাবর্তে অনুষ্ঠিত এক ঋষি-সম্মেলনে মনু 'সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের' প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তার মোকাবিলা করা। অনুমান, এরপর থেকেই ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের সূচনা হয়। যেসব গোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত কিংবা যারা ছিল যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত তারা এক জায়গায় এসে সভ্য ও সংগঠিত ভাবে থাকতে শুরু করে। এই সম্মেলন আরও নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই সর্বপ্রথম ঋগ্বেদ, উপনিষদ এবং অন্যান্য প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের সংকলনের কাজ শুরু হয়। সনাতন ধর্ম, যা আজ হিন্দুধর্ম

নামে পরিচিত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপরেখা নির্মাণের কাজও শুরু হয় এই সম্মেলনে। দশ হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষিদের জ্ঞান ও বহুদর্শিতার যে পরিচয় এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে সত্যিই শিহরিত হতে হয়। ব্রিটিশরা মনুস্মৃতিকে হিন্দুদের 'আইনগ্রন্থ' হিসেবে বর্ণনা করেছিল। মহাপ্লাবনের সমসাময়িক ঋষি ভৃগু তাঁর তৈত্তিরীয় উপনিষদে আত্মার স্বরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় উদঘাটন করে প্রমাণ করেছিলেন ভারতের মুনিঋষিরা সৃষ্টির সেই ঊষালগ্নেই মানব শরীর ও মানবমনন সম্পর্কিত গভীরতর জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবর্তের উৎস সন্ধানে :

ইউরোপ এবং ভারতের একাধিক গবেষক দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সরস্বতী নদীর উৎস এবং অধুনা লুপ্ত স্রোতোধারা নিয়ে গবেষণা করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বৈদিক যুগের আরেক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ব্রহ্মবর্ত সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ কম। অথচ এই ব্রহ্মবর্ত ছিল মুনিঋষিদের প্রিয় বাসভূমি। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের অনেকগুলি এখানে লেখা হয়েছিল। তাছাড়া, ব্রহ্মবর্ত সনাতন ধর্ম বা আজকের হিন্দুধর্মের ভিত্তিভূমিও। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসের খোঁজ করতে হলে ব্রহ্মবর্ত সম্বন্ধে ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

মনুস্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ নং শ্লোকে ব্রহ্মবর্তকে সেকালের দুই গুরুত্বপূর্ণ নদী সরস্বতী এবং দৃশদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মবর্তকে বলা হোত দেবভূমি, দেবতারা নিজেরাই যা সৃষ্টি করেছিলেন। আধুনিক হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় হলো সেই অঞ্চল, যেখানে প্রাচীন বেদ উপনিষদ এবং মনুস্মৃতি যে অন্তত আংশিক ভাবে

রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখানে ভৃগু, চ্যবন, রিচিক, পিপলাদ, দধীচি, নচিকেতা, উদ্দালক, সায়ন, শাণ্ডিল্য, দুর্বাসা প্রমুখ ঋষি বসবাস করতেন। তাঁদের আশ্রমের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। বৈদিক শাস্ত্রাদি প্রণয়নে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দশ হাজার বছর আগে হিমালয়জাত সরস্বতী কচ্ছের রানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হোত। বস্তুত সরস্বতীই ছিল ব্রহ্মবর্তের পশ্চিমসীমা। উত্তরের সীমা ছিল দৃশদ্বতী নদী।

দৃশদ্বতীর গমনপথ :

দৃশদ্বতী বর্তমানে সাহিবি নামে পরিচিত। এ নদীর যাত্রা শুরু আজমেড়ের পুষ্কর হ্রদ থেকে। পুষ্করেই রয়েছে ভারতের সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন ব্রহ্মামন্দির। অনেকে মনে করেন ব্রহ্মবর্ত কথাটির অর্থ ব্রহ্মার নিজের দেশ। পুষ্কর হ্রদ থেকে নির্গত হয়ে দৃশদ্বতী চলে গেছে উত্তরে। আরাবল্লী পার্বত্য অঞ্চলে। এটা খুবই বিস্ময়ের, সাধারণ ভাবে নদনদীরা দক্ষিণমুখী হলেও দৃশদ্বতী স্পষ্টতই উত্তরমুখী। রাজস্থান-হরিয়ানার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সমতলে পৌঁছে দৃশদ্বতী পশ্চিমে বাঁক নিয়ে মিলিত হয়েছে সরস্বতীর সঙ্গে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলেই রচিত হয়েছে ব্রহ্মবর্ত রাজ্যের উত্তরসীমা।

৬,৫০০ বছর আগে ভূমিকম্প এবং ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে পুষ্কর হ্রদের সঙ্গে দৃশদ্বতীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে গমন পথ পরিবর্তন করে দৃশদ্বতী উত্তরে না গিয়ে পূর্বাভিমুখে বইতে থাকে। মিলিত হয় চম্বল নদীর সঙ্গে। তারপর সেই যুগ্মধারা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়। যাই হোক, বর্ষাকালে দৃশদ্বতী রাজস্থানের জয়পুর রেওয়াড়ি থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল শস্যশ্যামলা করে তুলত। বর্ষা ভালো হলে এই স্রোতোধারা আজও দেখতে পাওয়া যায় রাজস্থান এবং হরিয়ানার কোনো কোনো জায়গায়। তার এখনকার নাম সাহিবি।

সরস্বতীর গমনপথ :

বৈদিক সরস্বতী নদীর তীরে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। উপগ্রহ চিত্র অনুযায়ী আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হোত সরস্বতী। অনেক বৈজ্ঞানিকেরও তাই মত।

১৯৭৮ সালে রাজস্থানে মাটির নীচে জল খোঁজার সময় বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া বন্যার কথা জানতে পারেন। আরাবল্লীর পশ্চিম প্রান্তে ঝুনজুনু, জালোর এবং যোধপুর জেলাতেই ছিল এইসব বন্যাকবলিত অঞ্চল। প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী, দশ হাজার বছর আগে সরস্বতী এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে যেত।

১৯৮৯ সালে মরোক্কোর রাবাট থেকে প্রকাশিত ইনস্টিটিউট অব মাইনিং অ্যান্ড মেটালারজি পাবলিকেশনের একটি গবেষণাপত্রের অভিমত, 'গবেষণায় এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, আজ যা থর মরুভূমি নামে পরিচিত একদিন সরস্বতী তাকে শাসন করত। আরাবল্লীর পশ্চিম প্রান্ত থেকে নির্গত হয়ে সরস্বতী কচ্ছের রানের মধ্য দিয়ে গিয়ে আরব সাগরে মিলিত হয়েছে।'

ব্রহ্মবর্তের অপায়া নদী :

ব্রহ্মবর্তের আলোচনায় এখানকার অপায়া নদীর কথাও বলতে হবে। অপায়া হলো সেই নদী যার তীরে ভারতের শক্তিশালী রাজারা যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকতেন মুনিঋষিরা। ঋগ্বেদের বয়ান অনুযায়ী অপায়ার তীরে ছিল বহু ঋষির আশ্রম। অপায়ার জন্ম

রাজস্থানের নিম কা থানা নামক পাহাড়ে। তারপর মহেন্দ্রগড়ের দোসি পাহাড়, সায়ানা এবং বাগোট হয়ে সরস্বতীর সঙ্গে মিলন।

দেবভূমি ব্রহ্মাবর্ত :

আগেই বলা হয়েছে, ব্রহ্মাবর্তে যেসব ঋষিরা বসবাস করতেন বেদ-উপনিষদ রচনায় তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাকে বেদে 'অপৌরুষেয়' আখ্যা দেওয়া হয়েছে যার অর্থ সাধারণভাবে 'অতিমানবিক'। বস্তুত বেদজ্ঞ ঋষিদের সান্নিধ্যই ব্রহ্মাবর্তকে দেবভূমিতে রূপান্তরিত করেছিল। মহাভারত এবং পুরাণমতে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম ছিল দোসি পাহাড়ের পাদদেশে দীপোদক অঞ্চলে। নিকটেই বয়ে যেত বাদুসার নদী। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভৃগুকচ্ছের দিকে সরে যাওয়ার আগেকার সরস্বতী এবং এখনকার দোহান নদীর সঙ্গমস্থলে যে ব-দ্বীপ অঞ্চল যেখানেই ছিল প্রাচীন দীপোদক। দশ হাজার বছর আগে মহর্ষি ভৃগু ছিলেন জোতির্বিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যার বহুদর্শী পণ্ডিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে তিনি মানুষের মনন এবং বুদ্ধি নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ভারততত্ত্ববিদদের অভিমত, প্রাচীন উপনিষদ যেমন তৈত্তিরীয়, ঐত্রীয়, কঠ, মাণ্ডুক্য, ছান্দোজ্ঞ, বৃহদারণ্যক ইত্যাদির রচনা কোনো একটি পরিবার বা গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। রচনা চলাকালীন তাঁরা বা তাঁদের উত্তরসূরিরা ব্রহ্মাবর্ত ছেড়ে দূরে কোথাও যাননি। বেশিরভাগ ঋষির আশ্রম ছিল বৈদিক অপায়া নদীর তীরে, যা এখন দোহান নদী নামে পরিচিত। ব্রহ্মাবর্ত ছিল কোলাহল-বর্জিত শান্ত দেশ, আবার সবদিক থেকে উন্নত দেশও।

ব্রহ্মাবর্তের ধাতুবিদ্যা :

ঋগ্বেদের বর্ণনা অনুযায়ী সরস্বতী অববাহিকার মানুষ সেই বৈদিক যুগেই তামা বা আয়াস্কের ব্যবহার জানত। বস্তুত অঢেল তামা জোগান দেবার ক্ষমতার জন্যেও ব্রহ্মাবর্ত সে যুগে বিশেষ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। এমনকী পরবর্তীকালেও ব্রহ্মাবর্তের ওপরে ছিল সারাদেশের তামা জোগানোর ভার। হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা নানা কারণে তামা ব্যবহার করত। এই তামা আসত খেতরির তামার খনি থেকে। খেতরি থেকে একটা রাস্তা ছিল মহেঞ্জোদারো পর্যন্ত। তামায় বোঝাই করা বলদে টানা গাড়ি যাতায়াত করত

দোসি পাহাড়ে ঋষি চ্যবনের আশ্রম।

ওই রাস্তায়। শুধু খেতরি নয়, নরনাল থেকে শিকার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র ছিল তামা। বৈদিক যুগের মানুষ নানা প্রয়োজনে তামার ব্যবহার করত। তৈরি হোত কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কুঠার, মাছ ধরার বঁড়শি, ছুরি, তিরের ফলা, অলঙ্কার ইত্যাদি। এছাড়া ছিল চিকিৎসার প্রয়োজনে তামার ব্যবহার। সে যুগের মানুষ জানতেন তামার পাত্রে রাখা জল দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকে। রাজবৈদ্য অশ্বিনী কুমার ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্দেশে এমন এক বিশেষ তাম্রনির্মিত জলাধার বানানো হয়েছিল যার জল খেয়ে ঋষি চ্যবন রোগমুক্ত হন। দোসি পাহাড়ের চূড়ায় মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমের ভগ্নাবশেষে এরকম একটি জলাধার এখনও রয়েছে।

কৃষি :

মহাপ্লাবনের সময় থেকেই ব্রহ্মাবর্তের মানুষ কৃষিকাজ জানত। লক্ষ্ণৌ-এর সাহ্নি ল্যাবের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি প্রাচীন সরস্বতী-দৃশদ্বতীর অববাহিকার কয়েকটি হ্রদে অনুসন্ধান চালিয়ে যবের পরাগরেণুর সন্ধান পেয়েছেন। পরীক্ষার পর জানা গেছে ওই সব ৯৫০০ বছর আগে চাষ করা হয়েছিল। প্রমাণ মিলেছে জঙ্গল পুড়িয়ে চাষযোগ্য জমি তৈরির। চাষাবাদের পাশাপাশি পশুপালনও ব্রহ্মাবর্তে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

আয়ুর্বেদ :

ব্রহ্মাবর্তের মানুষের আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছিল। দশ হাজার বছর আগে এমন এক রোগপ্রতিকারক আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা আবিষ্কৃত হয় যা থেকে তৈরি ওষুধ খেয়ে ঋষি চ্যবন সুস্থ হয়েছিলেন। সেই থেকে ওষুধটির নাম হয় চ্যবনপ্রাশ। আজও যা সারা ভারতে জনপ্রিয়। সে যুগের বহু শাস্ত্রে অস্ত্রোপচারের নানা উপায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকেরা যে অস্ত্রোপচারে পারদর্শী ছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে মহাভারত এবং পুরাণে।

উপসংহার :

আমাদের দেশে বৈদিক যুগকে মাত্র ২৫০০-৩০০০ বছরের পুরনো বলে দেখানো হয়। মনুস্মৃতিকে বলা হয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রচনা। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বস্তুত, মনু এবং মহর্ষি ভৃগু ছিলেন মহাপ্লাবনের সমসাময়িক মানুষ। অর্থাৎ দশ হাজার বছর আগে তাঁরা জীবিত ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বা সনাতন ধর্মের সূত্রপাত তারও বহু আগে। সংস্কৃত পুরাণে ঋষিদের ১০০টি প্রজন্মের কথা বলা হয়েছে যাঁদের অনেকেরই জীবনকাল মহাভারতের পূর্ববর্তী যুগে। সুতরাং প্রতিটি শাস্ত্রের তারিখ নির্ণয় ঠিকমতো না হলে আমরা কিছুতেই আমাদের সাংস্কৃতিক উৎস খুঁজে পাব না। এই মুহূর্তে সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দোসি পাহাড়ের মহর্ষি ভৃগু এবং চ্যবনের আশ্রম থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলেই অনেকখানি করা হবে। হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় এমন একটি জায়গা যা বৈদিক যুগের কালনির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

(তথ্যসূত্র : অর্গানাইজার)

পশ্চিমবঙ্গ ফতোয়াবাজদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে

প্রবাল চক্রবর্তী

গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির শেষটুকু নিশ্চয়ই মনে আছে? জাদুকর বরফি একটা ওষুধ বানিয়েছিল, যাতে বোবাদের মুখে কথা ফোটে। সুযোগ বুঝে গুপী সেই ওষুধের পুরিয়াটা হাল্লা থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। শুণ্ডিতে ফিরেই গুপী আগুন জ্বেলে সেই পুরিয়াটা ফেলে দিল আগুনে। ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে ওষুধ ছড়িয়ে পড়ল সারা রাজ্যে। দেখতে দেখতে জনরবে মুখর হলো শুণ্ডি। গতকাল পর্যন্ত যে প্রজারা ছিল বোবা, বরফির ম্যাজিকে মন্ত্রবলে তাদের মুখে কথা ফুটলো।

তারিক ফতেহ্ ও বরকতি

আজ দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সিনেমাটা হঠাৎ সত্যি হয়ে গেছে। শুণ্ডিরাজ্যের বোবাদের মুখে বাগ্‌দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে। ম্যাজিক!

কলকাতার টালিগঞ্জের ছেলে আমি। প্রতিদিন শেষরাতে ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসতাম, আনোয়ার শাহ রোডের মসজিদের মাইকগুলো থেকে ভেসে আসা আজানের তীব্র স্বরে। ভাষাটা অজানা, সুরটা আরো অচেনা। শুনে গা-ছমছম করত। বুঝতে পারতাম না, প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়ে জোর করে কেন আজান শোনানো হচ্ছে আমাকে। শুধু আমাকে নয়, এলাকার প্রতিটি মানুষকে। কেন? মনে হোত, ওই আজানের উদ্দেশ্য যেন নামাজিদের মসজিদে আসতে বলা নয়, উদ্দেশ্য অন্য কিছু। উদ্দেশ্য আশেপাশের লোকেদের জানানো, আমরা আট'শো বছর তোদের ওপর রাজত্ব করেছিলাম, এখনো করছি। এখনো আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। আমাদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই তোদের। শিশুমনে এই জবরদস্তি কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা কি কেউ কখনো ভেবে দেখেছে? কেউ কি কখনো এই জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে? কেউ না। ভেবেছিলাম, এমনটাই চলবে চিরকাল। কিন্তু আজ যেন কোন মন্ত্রবলে মৌন মুখর হয়েছে। এই জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রথম বলতে শুনলাম পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্যানাডিয়ান কলামিস্ট তারেক ফতেহ্‌কে। উনি উত্তরাঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে এক মসজিদে ঢুকে ইমামকে বলে এসেছিলেন, আপনার প্রতিবেশী হিন্দুরা খুব ভালো, যে ওরা মাইক খুলে নিয়ে যায় না। ওদের ভালোমানুষীর এত সুযোগ নেবেন না। আজান দিতে হয়, খালি গলায় দিন। তাছাড়া, আগেকার দিনে অ্যালার্ম ঘড়ি ছিল না, কিন্তু এখন তো রয়েছে! নামাজিদের কাছে কি অ্যালার্ম ঘড়ি নেই? কিন্তু কজনই বা তারেক ফতেহ্‌র নাম শুনেছে। সে কথাটা তো বলিউডের প্রথিতযশা গায়ক সোনু নিগম সম্পর্কে বলা যায় না! সোনু যখন জবরদস্তি মাইকে আজানের প্রতিবাদে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুললেন, খুব অবাক হলাম। চিরকাল দেখে এসেছি, ওঁদের মতো সেলিব্রিটিরা ধরি-মাছ- না- ছুঁই-পানি করে জীবনটা কাটিয়ে দেন। একমাত্র গায়ক অভিজিৎ, আমাদের অভিজিৎ ভট্টাচার্য মাঝে মাঝে মুখ খুলে সকলের বিরাগভাজন হতেন। কিন্তু এবার সোনুর পাশে, অভিজিতের পাশে মুম্বইয়ের অর্ধেক ফিল্মি দুনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। ম্যাজিক ছাড়া আর কী বলব এটাকে?

ম্যাজিক শুধু মুম্বইতেই হচ্ছে, এমনটা নয়। বরফির ধোঁয়া তো দেখছি শুণ্ডিরাজ্যের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। তারেক ফতেহ্‌র টিভি প্রোগ্রাম 'ফতেহ্ কা ফতোয়া' ভারতীয় মুসলমান সমাজে আত্মসমালোচনার ঝড় তুলেছে। উত্তরপ্রদেশে দলে দলে মুসলমান মহিলা অবগুণ্ঠন হঠিয়ে বেরিয়ে আসছেন, তিন তালাকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আঁধি উঠেছে। উজমা আহমেদ পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে বলছেন, ভারত পৃথিবীর সেরা দেশ, আর পাকিস্তান হলো মৃত্যুকূপ। সেখানে যাওয়া সহজ, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। পাকিস্তানে ছেলেরাও নিরাপদ নয়, মেয়েদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যায়। সারা পৃথিবীর সামনে পাকিস্তানের মুখে, দ্বিজাতিতত্ত্বের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন ভারত-কন্যা উজমা আহমেদ। ক'বছর আগেও যদি এ ঘটনা ঘটত, বলতাম--- অবিশ্বাস্য! আজ মনে হচ্ছে, ম্যাজিক!

ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের একটা নতুন বদনাম জুটেছে। পশ্চিমবঙ্গ হলো ফতোয়াবাজদের রাজ্য। নরেন্দ্র মোদী, সোনু নিগম, দিলীপ ঘোষ--- সবার জন্যই ফতোয়া। সবই পশ্চিমবঙ্গ থেকে। মমতাময়ীর বদান্যতায় বড়, মেজো, সেজো, ছোটো, ইঞ্চি, ফুট, গজ সব মাপের ফতোয়াবাজদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। এদের পালের গোদা ছিল সেই ইমাম বরকতি। মমতাময়ীর সিংহভাগ মমতা এর উপরেই বর্ষিত হোত। সেই লাই পেয়ে মাথায় উঠেছিল লালদাড়ি বরকতি। জেহাদ করব, বাংলাকে পাকিস্তান বানাবো, আরও কত কী। এদিকে দিদি বাংলার বেকার

ছেলেমেয়েদের বলছেন, চাকরি কোথায় পাবে, তারচেয়ে বরং তেলেভাজার দোকান খোলো। উল্টোদিকে বরকতির তিন ছেলের জন্য পেছনের দরজা দিয়ে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হায়রে মমতাময়ী দিদির অন্ধবিশ্বাসী ভাইরা! একবার তো দিদিকে জিজ্ঞেস করুন— দিদি, আমাকে চাকরি না দিয়ে বরকতির তিন ছেলেকে কেন চাকরি দিলেন? বরকতি আপন, আর আমি পর? কেন দিদি, কেন? কেউ জিজ্ঞেস করেনি সেকথা। কিন্তু সময় কীভাবে বদলাচ্ছে দেখুন! সেই সর্বশক্তিমান বরকতির এখন আমও গেল ছালাও গেল। মসজিদের ইমামের চাকরি গেল, গাড়ির লালবাতি গেল, পাগড়ি খুলে মসজিদ থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো তাকে। হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে মসজিদের সামনে রাস্তায় ফেলে পেটালো। ম্যাজিক ছাড়া আর কী এটা? এতেও শেষ হয়নি। আজ কলকাতার রাস্তা উত্তাল হয়েছে বরকতির গ্রেপ্তারের দাবিতে। কে বলতে পারে, আগামীকাল সেটাও হয়তো সত্যি হবে? জেলের ভেতর তেলের ঘানি পিষতে পিষতে বরকতি উপলব্ধি করবে, দেশদ্রোহিতা কতবড় অপরাধ। ভাবতেই খুশিতে নেচে উঠতে ইচ্ছে করছে। হতেই পারে। দিদির রাক্ষসকুলে তো এখন একে একে নিভিছে দেউটি। এদিকে বরকতির ছেঁচকি-পোড়া হচ্ছে, ওদিকে ত্বহা সিদ্দিকী বলছেন, দিদির দলবলই নাকি জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা লাগিয়ে আর এস এস-বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। আসল দাঙ্গাবাজ হলো ঘাসফুল-পার্টি। বলছেন, উন্নয়নের স্বার্থে তিনি বিজেপিকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। হায় হায় দিদি, হিজাব মাথায় দিয়ে নামাজ পড়ার এত নাটক, এত ইফতার পার্টি, এত ইমাম ভাতা, সব মাঠে মারা গেল? ম্যাজিক আরও দেখলাম।

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সময়কার বাংলার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে ঋষি বঙ্কিম লিখেছিলেন, ‘‘অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল— মুই হেঁদু’’। বহুদিন আগে পড়া আনন্দমঠ উপন্যাসের ওই জায়গাটা আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ধান্দাবাজ সব রাজনৈতিক নেতা, হিজাব আর

সোনু নিগম

ফেজটুপি ছাড়া যাঁরা ঘরের বাইরে বের হতেন না, তাঁরা আজ হঠাৎ ঘটা করে হনুমান-জয়ন্তী

মমতাময়ীর বদান্যতায় বড় মেজো সেজো ছোটো ইঞ্চি ফুট গজ সব মাপের ফতোয়াবাজদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। এদের পালের গোদা ছিল সেই ইমাম বরকতি। মমতাময়ীর সিংহভাগ মমতা এর উপরেই বর্ষিত হোত। সেই লাই পেয়ে মাথায় উঠেছিল লালদাড়ি বরকতি। জেহাদ করব, বাংলাকে পাকিস্তান বানাবো, আরও কত কী।

পালন করতে লেগে পড়েছেন। ফোঁটা-তিলক কেটে ঘণ্টা নাড়ছেন, প্রসাদ বিলোচ্ছেন। যাঁরা নিজেদের গোমাংস ভক্ষণের কথা সগর্বে গলা ফাটিয়ে সংসদে বলতেন, আজ তাঁরা জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করছেন— মুই হেঁদু, মুই হেঁদু! এটা কিন্তু বাঙালির জন্য একটা মেসেজ। জেনে রাখো বঙ্গপুঙ্গব! ফোঁস না করলে কেউ তোমাকে সমীহ করবে না। সবাই মাড়িয়ে চলে যাবে। গান্ধীজীর ওই তিন বাঁদর— ওই একগালে চড় মারলে আরেক গাল এগিয়ে দেওয়ার পরামর্শ, ওগুলোই যতনষ্টের গোড়া। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একটা কথা বাঙালি খুব কপচায়— ‘যত মত তত পথ’। খুব ভালো কথা। কিন্তু ঠাকুর তো আরও একটা কথাও বলেছেন, সেটা কি ভুলে গেলি পাগলা? ঠাকুর বলেছেন, তুই অহিংস, কাউকে ছোবল মারবি না, সে তো বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে ফোঁস করতে তোকে কে বারণ করেছে? সেই ঋষিবাক্য ভুলে গিয়ে দুনিয়ার জেহাদির লাথি-ঝাঁটা খেয়েছে বাঙালি। তারপর যেই না দা-কাটারি হাতে মিছিল করল রামনবমীতে, অমনি রাজ্যজুড়ে সব ভূতের মুখে রামনাম শুরু হয়ে গেল। আহা, দেখেও আনন্দ হয়! এখন শুধু একটাই প্রার্থনা— বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণ যেন অক্ষয় হয়! আবার যেন মতিভ্রম না হয় বাঙালির। অশ্বমেধের ঘোড়া যেন না থামে। জয় মা কালী! শুণ্ডিতে তো বোবারা মুখর হলো। এখন দেখা যাক, হাল্লা কতদিন সেই ধোঁয়া থেকে দূরে থাকে। অশ্বমেধের ঘোড়া এগিয়ে চলেছে, পাহাড় পর্বত নদীনালা জলা-জঙ্গল মরুভূমি চিরে। দেখা যাক, সেই ভূমিকম্পের সামনে উইয়ের ওই ঢিপিগুলো কতদিন টেকে। বাবুইয়ের ওই বাসাগুলো কতদিন এই দাবানলের আঁচ থেকে গা বাঁচাতে পারে। ভাবছেন, কঠিন কাজ? বদহজম হবে? আরে, ইস্বল-বাতাপীদের যদি হজম না করতে পারলাম, তবে কীসের আমরা অগস্ত্যমুনির বংশধর?

সব ভূতের মুখে যদি রামনাম না আনতে পারলাম, তবে কীসের আমরা রামভক্ত? রক্তবীজের ঝাড়কে যদি রক্ত অস্থি মেদ মজ্জা শুদ্ধু চেটেপুটে সাফ না করতে পারি, তবে কিসের আমরা মা কালীর বাচ্চা? ■

এই সময়

পঞ্জাব মেল, ১০৫

১ জুন, ২০১৭, পঞ্জাব মেলের বয়েস হলো ১০৫ বছর। এটি ভারতীয় রেলের দূরপাল্লার

ট্রেনগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। শুরুতে ট্রেনটি তৎকালীন বম্বের বালার্ড পিয়ের মোলে স্টেশন থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যেত। সময় লাগত ৪৭ ঘন্টা।

সুবিচার

বাবা ট্রাফিক আইন ভেঙেছিলেন। বিচারক পাঁচ বছরের ছেলের কাছে জানতে চাইলেন

বাবার কী শাস্তি হওয়া উচিত? ৯০ অথবা ৩০ ডলার জরিমানা, নাকি কিছুই নয়? ছেলের বিস্মিত জবাব, 'তুমি খুব ভালো জজ।' বাবার অপরাধ স্বীকার করেও বাবাকে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে বাঁচানোর এই ঘটনায় হতবাক দুনিয়া। ঘটনাটি আমেরিকার।

সাপের ছোবল

টর্নেডোর নাম স্নেক। সেই সাপ আছড়ে পড়ল মেক্সিকোর সেনাপুচি শহরে।

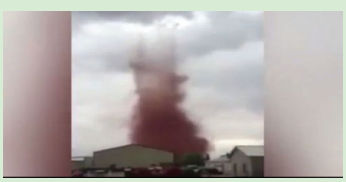

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, 'আকাশে যেন সাপ কিলবিল করছিল। মনে হচ্ছিল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।' ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কেউ হতাহত হননি।

সমাবেশ -সমাচার

সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার সাংস্কৃতিক সম্মেলন

গত ১৯ মে উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতী, গাজোল শাখার বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গাজোলের মনোমোহন শ্রীমতী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের সভা কক্ষে। অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মালদা জেলা সহ-সভাপতি নিখিল চন্দ্র মজুমদার। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর সহ-সভাপতি সঞ্জয় গাঙ্গুলী এবং প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক তড়িৎ মিশ্র।

সম্মেলনে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিক্ষিকা জয়া চক্রবর্তী, স্বর্ণাভ

চক্রবর্তী, পুষ্প সরকার, অভ্যস্ত চ্যাটার্জী সুপর্ণা সরকার, পরেশ চন্দ্র সরকার, সঞ্জীব দাস, চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী, রাজকুমার গুইন, অজয় নন্দী, নবনীতা পাল, পপি দাস, কেয়া সরকার ও চন্দনা সরকার। একক সঙ্গীত পরিবেশন করে শিশুশিল্পী মানব জ্যোতি মাহাতো, অভ্যস্ত চ্যাটার্জী, অর্ঘ্যজ্যোতি সরকার, সায়নদীপ সূত্রধর, সুপর্ণা সরকার, নবনীতা পাল। এছাড়াও সংস্কার ভারতীর সভানেত্রী তথা দূরদর্শন শিল্পী শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী। তবলায় সঙ্গত করেন রাজীব দাস, সুব্রত সরকার এবং বিকি সাহা। পার্কাশনে ছিলেন পরেশ চন্দ্র সরকার। নৃত্য পরিবেশন করেন মৌটুসী সরকার, সুপর্ণা সরকার এবং দীপান্বিতা রায়। আবৃত্তিতে ছিলেন পুষ্প সরকার, মধুসূদন কুণ্ডু, বন্দনা চ্যাটার্জী। গিটার বাজিয়ে শোনান সঞ্জীব দাস। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান শুনিয়ে সকলকে মাতিয়ে দেন দীপক সরকার ও মনোরঞ্জন সরকার। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার সংগঠন সম্পাদক পরেশ চন্দ্র সরকার। বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী ও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক তড়িৎ মিশ্র। এদিন সংস্কার ভারতীর গাজোল শাখার পরিচালন সমিতির গঠিত হয়। সভানেত্রী— শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী, সম্পাদক— রাজকুমার গুইন, সংগঠন সম্পাদক— পরেশ চন্দ্র সরকার। কোষাধ্যক্ষ— অজয় নন্দী। মাতৃশক্তি প্রমুখ— শ্রীমতী পুষ্প সরকার, সঙ্গীত প্রমুখ— স্বর্ণাভ চক্রবর্তী।

সিউড়ী পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বস্ত্রদান

বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আগয়াবাঁদি গ্রামে কয়েকমাস আগে ২১টি বনবাসী পরিবারের ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং ৫ বছরের এক শিশু ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

এই সময়

প্যারিসে ওড়িশা

কিছুদিন আগে ব্রাজিলে ভাংড়া হয়ে গেছে। সম্প্রতি প্যারিসে হয়ে গেল ওড়িশি

নৃত্যোৎসব। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শাশ্বত যোশী ইফেল টাওয়ারের সামনে সম্বলপুরী লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান করলেন। ভারতীয় নৃত্যকলার জাদুতে মুগ্ধ সবাই।

রোবট পুরোহিত

তিনি রোবট হলেও পেশায় পুরোহিত। চার্চে আসা ভক্তকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছেন

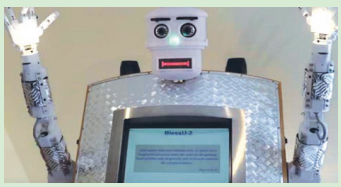

তিনি কী ধরনের আশীর্বাদ চান। জানার পরেই আউড়াচ্ছেন বাইবেলের মন্ত্র। সঙ্গে শেখানো বুলি, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' তার কর্মস্থল জার্মানির একটি চার্চ। নাম ব্লেস ইউ টু।

অপরাজিতা

পাঁচ বছর আগে একটি দুর্ঘটনার পর হরমেহর কওরের ঘাড়ে পক্ষাঘাতের লক্ষণ ধরা পড়ে।

চিকিৎসকেরা রায় দিয়েছিলেন ভালো হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঘাড় নাড়তে না পারলে কী হয় এবারের সিবিএসই-র পরীক্ষায় সে ৯১.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের মুখ্য কার্যালয় কলকাতা থেকে পাঠানো ত্রাণ সামগ্রী গত ১০ মে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সিউড়ী নগর সমিতির ব্যবস্থাপনায় ২১টি বনবাসী পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে জামা-প্যান্ট, গেঞ্জি, চুড়িদার, শাড়ি, কম্বল ও রান্নার বাসনপত্র দেওয়া হয়। সিউড়ী নগর সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মণ হাঁসদা, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও কবি-সাহিত্যিক বিশ্বনাথ দে, বীরভূম জেলার সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, শীতল মণ্ডল, তপন দাস, রামেশ্বর মার্ডি ও দেবব্রত মহান্ত। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম অসহায় বনবাসীদের পাশে দাঁড়ানোয় গ্রামবাসীরা খুবই খুশি।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ব্যাখ্যানমালা

গত ২৯ মে শ্রীবড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে কলকাতার মহাজাতি সদনের অ্যানেক্সে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ব্যাখ্যানমালার আয়োজন করা হয়। ব্যাখ্যানমালায় 'নারীজাতি বস্তু নয়', (দুর্গা সপ্তশতী অনুসারে এক পূর্ণদৃষ্টি) বিষয়ে

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি, চিন্তক তথা মধ্যপ্রদেশ সরকারের সংস্কৃতি সচিব মনোজ কুমার শ্রীবাস্তব। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সূর্য প্রসাদ দীক্ষিত, প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাকেশ কুমার ওঝা। অনুষ্ঠানে 'আচার্য বিষ্ণুকান্ত : বিচার প্রবাহ' গ্রন্থের প্রকাশ হয় ড. সূর্যপ্রসাদ দীক্ষিতের হাতে।

কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরিবার প্রবোধনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামে অশীতিপর প্রবীণ নাগরিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা হলেন— (১) ৯৭ বছরের শ্বেতবরণী ঘোষ, (২) ৯৪ বছরের নারায়ণ ভট্টাচার্য, (৩) ৮৬ বছরের দোকড়ি ঘোষ এবং (৪) ৮৬ বছরের প্রীতিলতা ঘোষ। প্রথমে পরিজনরা তাঁদের পা ধুয়ে ধূপ, দীপ, ধান, দূর্বা, চন্দন ও মালা দিয়ে প্রত্যেককে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মাধ্যমে বরণ করে নেন। তারপর পরিবার প্রবোধনের পক্ষ থেকে ধুতি, শাড়ি, গীতা-সহ দক্ষিণা তাঁদের হাতে তুলে দেন প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি উপস্থিত সকলের সামনে পরিবার প্রবোধনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

এই সময়

রমজানে অভুক্ত

রমজান মাসে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির হস্টেলে বসবাসকারী হিন্দু ও অ-মুললমান ছাত্রদের ক্যাম্পাসের বাইরে

গিয়ে খেয়ে আসতে হয়। মেসে দুপুরে রান্না বন্ধ থাকে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা টুইট করে খবরটি দিয়েছেন। খবর প্রকাশিত হওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃপক্ষ

মানবিক

আরও একবার ভারতীয় সেনা তাদের হৃদয়বেত্তার পরিচয় দিল। ভুল করে

নিয়ন্ত্রণরেখার এপারে চলে আসা ওয়াসালাত খান (১৩) এবং মহম্মদ ইফতিকার খানকে (১২) পাকিস্তানে তাদের গ্রামের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিল সেনা।

দিল্লিতে জিএসটি

১ জুলাই থেকে সারাদেশের সঙ্গে দিল্লিতে জিএসটি করব্যবস্থা চালু করার জন্য দিল্লি বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে জিএসটি বিল

পাশ করেছে। উল্লেখ্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এতদিন জিএসটির বিরোধিতা করে আসছিলেন।

সমাবেশ -সমাচার

পরিবার প্রবোধনের আলোচনা সভা

গত ১৮ মে উত্তর মালদা জেলার স্বরূপগঞ্জ খণ্ডের গোপালপুর গ্রামে এক পরিবার প্রবোধনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ দেবেশ চন্দ্র মণ্ডল। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। তিনি মা-বোনেদের সমাজে ও পরিবারে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করান। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা জেলার জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ বাদল প্রামাণিক ও জেলা গ্রাম বিকাশ প্রমুখ দুর্গাচরণ থোকদার। সভায় ৮০ জন মা-বোন-সহ মোট ১০৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন স্বরূপগঞ্জ খণ্ড কার্যবাহ লিটু দাস।

বাঁকুড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রাক্তনী মাধ্যমিকে যুগ্ম দ্বিতীয়

বাঁকুড়া বড়কালীতলা সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রাক্তনী মোজাম্মেল হক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে যুগ্ম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তাঁর

এই কৃতিত্বের জন্য শিশু মন্দিরের পক্ষ থেকে আচার্য-আচার্যা, জেলা সভাপতি অরুণ চন্দ্র পাল বাড়িতে গিয়ে অভিনন্দন জানান। তার বাবা আব্দুল মামুদ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। তিনি বলেন, মোজাম্মেলের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যর জন্য শিশু মন্দিরের অবদান অনস্বীকার্য। আমার ছেলের ভিত শিশু মন্দিরের থেকেই তৈরি হয়েছে। মোজাম্মেল ২০০৪ সালে বড়কালীতলা সরস্বতী শিশু মন্দিরে ভর্তি হয়। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি হয়।

বর্ধমানে শ্রীহরিবোলা আশ্রমে পরিবার প্রবোধন সভা

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার মাজিদা অঞ্চলের ভোলাডাঙা গ্রামে শ্রীহরিবোলা আশ্রমে গত ১৫ মে দিবারাত্রিব্যাপী পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। আশেপাশের ৭টি গ্রাম থেকে কয়েকশো মানুষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আশ্রম কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ও উদ্যোগে পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র ও প্রান্তটোলীর সদস্য বিনয়ভূষণ দাস পরিবার প্রবোধনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সঙ্কটে
জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান অনিবার্য

কে. এন. মণ্ডল

সারদা-নারদার হুলে বিদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে ঘনীভূত রাজনৈতিক সঙ্কট, তথা শিক্ষায় নৈরাজ্য এবং শিল্পে পশ্চাদগামিতা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। ক্ষমতাসীন দল এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে মরিয়া। রাজনৈতিক সঙ্কটের দায় রাজনীতিকদের। কিন্তু শিক্ষায় এবং শিল্পে পশ্চাদগামিতা রাজ্যবাসীকে গভীর তমসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ক্লাবভাতা বা অন্য ডোলের ব্যবস্থা করেও কর্মহীন যুব সম্প্রদায়কে চুপ করিয়ে রাখা যাবে না— কেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কাহিনিতে চিড়ে ভিজবে না। কারণ, এই সমস্ত সঙ্কট রাজ্যবাসীর আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রায় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে। সামাজিক জীবনযাত্রার মানদণ্ড শুধুমাত্র আর্থিক উন্নয়নে সীমাবদ্ধ নয়, উন্নত, নিশ্চিন্ত, নির্বিঘ্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রাও এর অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষিত, আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ নিজেই নিজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে, সেখানে ডোল রাজনীতির ভূমিকা গৌণ। রাজনীতির খেলোয়াড়রা তখন প্রকৃত অর্থে সমাজসেবীর ভূমিকা নিতে বাধ্য হবে, দুর্নীতিমুক্ত হবে রাজনীতি। শুধু তখনই, সচেতন নাগরিক সমাজ উপহার দেবে 'আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা', যার বড়াই করছে ভারতবর্ষ।

তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সঙ্কট কথাটির তাৎপর্য কী? আর জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কোথায়? আমরা জানি ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে (বঙ্গীয় আইন সভার অংশ) ৫৮-২১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাংলা ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয় বাঙালি হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বাস্তববাদী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আপোসহীন লড়াই এবং সুরাবর্দী সরকারের কলকাতা দাঙ্গা এবং নোয়াখালি গণহত্যায় ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব পরিশেষে বাংলা মায়ের অঙ্গচ্ছেদ মেনে নেন, ভারত ভাগের পরিণতিতে। স্বাধীনতা লড়াইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিল, মুসলমান গরিষ্ঠ বাংলায় হিন্দুদের কোনো ভবিষ্যত নেই। এভাবেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট 'পশ্চিমবাংলা'ই বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্বের ঠিকানা নির্ধারিত হয়। আজ এমন কোন লক্ষণ প্রতিভাত হচ্ছে যা থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী মনে করছে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন বা সঙ্কটাপন্ন?

প্রসঙ্গত, ১৯৪৭-এ বাংলা ভাগের বিভাজন-রেখাটি টানা হয় জনবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে। দেশ ভাগের পর পর পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কোটি কোটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সীমান্ত রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করে, তাদের সিংহভাগ আসে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত যোগসূত্রের কারণে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যা ২৫ শতাংশ থেকে ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কমে আসে ২০ শতাংশে, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ২-৩ কোটি হিন্দু উদ্বাস্তুর গরিষ্ঠ সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যায় যুক্ত হওয়ার কারণে।

উপরন্তু উদ্বাস্তু আগমন ছাড়াও বেশ কয়েক লক্ষ মুসলমানও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাকিস্তানে চলে যায়। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুসলমান জনসংখ্যা কোন যাদু বলে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি চলে এলো— এ প্রশ্নটি জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের নিশ্চয়ই ভাবায়, কারণ এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব তথা রাজ্যটির সৃষ্টির ইতিহাসের যথার্থতার প্রশ্নটি জড়িত। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৫০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যেখানে ২৮১ শতাংশ একই সময় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৩৮৭ শতাংশ। এই বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকলে ২০৫৩ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান গরিষ্ঠ রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে— কাশ্মীরের পরে। আমরা আর একটি মুসলমান গরিষ্ঠ রাজ্য পাব ভারতবর্ষে। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র কী দাঁড়াবে? কাশ্মীরি পণ্ডিতরা না হয় পার্শ্ববর্তী হরিয়ানা-দিল্লীতে আশ্রয় নিয়েছে--- পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা বিহার-ওড়িশায় স্বাগত? পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারি জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথার যথার্থতা প্রমাণ হবে। ১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলাকে মুসলমান গরিষ্ঠ জেলা হিসেবে দেখানো হলেও দেশভাগের পরে কিছু সংখ্যক মুসলমানের দেশত্যাগ এবং পূর্ববাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের এই জেলায় আশ্রয় নেওয়ার পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় আবার মুর্শিদাবাদ জেলা হিন্দু গরিষ্ঠতা পায়— যেখানে বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় জনসংখ্যার ৭৩ শতাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত— আপনি বিশ্বাস করছেন তো?

জনসংখ্যা বিন্যাসের ভারসাম্য নষ্টের মূল কারণ হলো, ক্রমাগত বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ। গোদের উপর বিষ ফোড়ার মতো আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের অনুপ্রবেশ। বছর দুয়েক আগে আমাদের রাজ্যে জলপাইগুলি-কোচবিহারের সীমান্ত এলাকায় তাদের অভ্যর্থনার জন্য ক্যাম্প

খোলা হয়, হয়তো এতদিনে তাদের কেউ কেউ ভোট-ব্যাঙ্কে শামিল হয়েছে। মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, বীরভূম এবং নদীয়া জেলায় বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মতো ঘটনা ঘটছে শুধু তাই নয়, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে— খাগড়াগড় বিস্ফোরণ-কালিয়াচক থানা আক্রমণ তারই সাক্ষ্য বহন করছে।' আবার অনুপ্রবেশকারীদের কেউ কেউ নিষিদ্ধ ঘোষিত সিমি, আই. এস. আই, আই. এস. আই. এসের অর্থের প্রলোভনের শিকার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের জামাত— জে এম বি-র বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও ওই সমস্ত দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না--- ভোট-ব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে। ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গ, খিলাফৎপন্থীদের (আই এস আই এস) নীল নকশা অনুযায়ী--- অর্থাৎ মালদা-মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর 'মুসলমান স্থানে' পরিণত করার দিকে এগুচ্ছে। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে দ্বিমুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে— (১) বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে ক্রমাগত মুসলমান অনুপ্রবেশ (২) মুসলমান জন্মহার জ্যামিতিক হারে বাড়ানো। সে কারণেই মৌলবীরা ও মৌলবাদীরা তিন তালাক এবং বহু বিবাহ ব্যবস্থা রদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে, ইসলামের দোহাই দিয়ে। অথচ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, তুরস্ক, জর্ডন, মালদ্বীপ, সিরিয়া-সহ অধিকাংশ মুসলমান দেশ তিন-তালাক এবং বহু বিবাহ বন্ধে আইন পাশ হয়েছে। বাংলাদেশ শুধু সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না— স্বদেশীয় মুসলমান ভাইদের ভারতে অনুপ্রবেশে চুপ থেকে, বাড়তি জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান নীরবে করে চলেছে।

মুসলমান মৌলবাদের শিকার ইউরোপের দেশগুলি তাদের সযত্নে লালিত ঐতিহ্য ইতিহাসের বাইরে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া নিয়েও সন্দিহান— এদের মধ্যে কেউ কেউ জেহাদি নেই তো? সহনশীলতা, গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তার পীঠস্থান এই ইউরোপীয় দেশগুলির বার বার সন্ত্রাসী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে। সহনশীলতা ও উদারতায় মক্কা ফ্রান্সও পরপর বিস্ফোরণে প্রকম্পিত। তাদের একজন এমপি মুসলমান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় জেহাদিরা তার মুণ্ডের দাম ধরেছে কয়েক লক্ষ ইউরো— আর সেই জনপ্রতিনিধি নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন— ভাবুন তো অবস্থাটা। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মুসলমান মৌলবাদের স্বরূপ বুঝতে পেরে মুসলমানদের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে উদ্যত। আর আমাদের দেশের রাজনীতিকদের একাংশ শুধুমাত্র ক্ষমতা ভোগের অভিলাষে মৌলবাদীদের তোল্লা দিচ্ছে— এদের কাছে দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতার চেয়েও কুরশি মূল্যবান। তারা বলছেন— প্রয়োজনে 'দিল্লির দিকে তাকাবেন'--- কিন্তু আমরা যাব কোথায়— এ প্রশ্ন কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ করবেন না?

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু- মুসলমানের জনসংখ্যার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদে এবং তাতে লাভবান হবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই। বছর দুই আগে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক— তা হচ্ছে, 'কোনো এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যা ১৫ শতাংশের কম থাকলে সেখানে দাঙ্গা হলে হিন্দুরা প্রত্যাঘাত করে, আর এই সংখ্যাটি ২০-২৫ শতাংশের বেশি হলে দাঙ্গা হয় একতরফা। আর কোনো এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা ৩০ শতাংশ ছাড়ালে— সেখানে হিন্দুরা থাকতে পারে না'। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় বর্তমানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে— বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কিছু কিছু হিন্দুদের শহরের দিকে চলে আসাতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা, আদিত্যনাথের বক্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে। ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি মেনে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করার পরেও এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী রাজনীতি এবং তোষণ। ভারতীয় মুসলমানরা অন্য সকল নাগরিকদের মতো সমান অধিকার পাবে সেটা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের কাজ, বৈষম্য সৃষ্টি করে— সামান্য কিছু নগদ হাতে ধরিয়ে দিয়ে মুসলমান সমাজকে ভোট ব্যাঙ্কে পরিণত করে সংখ্যাগুরুদের থেকে আলাদা করে মানুষে-মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করা রাজনীতি, সংখ্যালঘুদের ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। পূজার ভাসান এবং মহরমের মিছিল পাশাপাশি চলতে পারবে না কেন— এ প্রশ্ন মুসলমানদেরই করতে হবে। সঙ্কীর্ণ মাদ্রাসা শিক্ষা বর্জন করে, মুসলমান ভাইদের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যদের মতো সমাজজীবনে প্রবেশের অধিকার অর্জন করতে হবে। কিন্তু সরকারের তোষণ নীতি এবং মুসলমান সমাজের একাংশের অপরাধ প্রবণতার প্রশ্নে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা- নিম্নবর্গীয় মুসলমান সমাজে মৌলবাদ এবং বেপরোয়া মনোভাবের জন্ম দিচ্ছে। আর এতে কুলোর বাতাস দিচ্ছে সরকারি ভাতাপ্রাপ্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজ— মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত উগ্রপন্থী কাজকর্মের বিষয় নীরব থেকে। এরা মকবুল ফিদা হুসেনের উলঙ্গ সরস্বতীর মূর্তিতে শিল্পীর স্বাধীনতা খোঁজে এবং শিল্পীর অধিকার রক্ষায় রাজপথে মিছিলে সামিল হয়। অথচ হজরত মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনের জন্য মুসলমান মৌলবাদীদের আক্রমণে প্যারিসের সরলি-আবো পত্রিকা অফিসে ১২ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদ করে না।

অতএব, পশ্চিমবঙ্গের ধূমায়িত অস্তিত্ব সঙ্কটের নিরসনে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষায় বে-আইনি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো, সকল নাগরিকদের কমন সিভিল কোডের আওতায় আনা এবং জাতীয়তা বিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সামনের সারিতে আনতে হবে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ আধিকারিক)

চিঠিপত্র

দুর্নীতি দমনে কড়া আইন

বিগত ৭০ বৎসর ধরে রাজনীতিবিদদের কৃপায় এবং শিথিল শাসন ব্যবস্থায় এই দেশে দুর্নীতি আষ্টে-পৃষ্টে গ্রামের পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে দিল্লি অবধি জড়িয়ে গেছে। সামগ্রিক চারিত্রিক ভ্রষ্টতায় এমন পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি যে মানবতা বোধ, ধর্মের ভয়, দেশের প্রচলিত আইন, ধর্মীয় নেতাদের বাণী, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কিছুই কাজে আসছে না। রাজনীতিবিদদের কল্যাণে আইনের প্রতি লোকের ভয় একেবারে মুছে গেছে। গ্রামে স্কুল পড়ুয়া একটি শিশুও বুঝে গেছে লেখা-পড়া না করলেও বড় হয়ে রাজনীতিতে ঢুকে কোনো প্রকারে একবার এম.এল.এ/এম.পি. অথবা ন্যূনপক্ষে পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার হতে পারলে সারা জীবনের জন্য কেল্লা ফতে। কারণ ওই শিশু চোখের সামনে দেখছে, কিছুদিন আগেও যে অর্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকটি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো, রাজনীতির আশ্রয়ে সে আজ মস্ত বড়লোক এবং সমাজে এক গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ে, উর্ধতন অফিসার থেকে প্রতিটি টেবিলে ঘুষের রাজত্ব— ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হয় না। পুলিশ তার জীবন বাজি ধরে রাত জেগে দুষ্কৃতীকে ধরে থানা অবধি পৌঁছাবার আগেই রাজনৈতিক নেতার থানায় ফোন এসে যায় দুষ্কৃতীকে ছেড়ে দেবার জন্য। কারণ, লোকটি তাঁর ও দলের ঘনিষ্ঠ। পুলিশও বুঝে গেছে এই পরিস্থিতিতে জান কবুল করার প্রয়োজন কী? ডাক্তার রোগীর কাছে ভগবান— কিন্তু কোনো কোনো ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রথমেই বলে দেন নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করাতে হবে। অন্তর্নিহিত কারণ, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মধুর সম্পর্ক।

এই অবস্থার পরিবর্তন করতে নতুন আইন করে কড়া দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করলে হয়তো কিছুটা কাজ হতে পারে।

১. দেশের সর্বোচ্চ আইন 'কনস্টিটিউশন' এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমানে এমন একটি কড়া আইনের প্রয়োজন যাতে সমগ্র সিস্টেম বদল করে মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়ক, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা, সরকারি অফিসার, কর্মচারী, সরকারি এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও পঞ্চায়েতের সমস্ত কর্তা যে-কোনো রকম দুর্নীতিতে সাজাপ্রাপ্ত হলে, তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায় এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা যাতে কোনো সরকারি স্কুল, কলেজে ভর্তি হতে না পারে।

২. আইন অনুযায়ী কড়া আদেশ জারি করা যাতে প্রত্যেক ডাক্তার তাঁদের FEES-এর বদলে বাধ্যতামূলক ভাবে রশিদ প্রদান করেন এবং ওই রশিদের নং এবং তারিখ ডাক্তারের দেওয়া কম্পিউটার প্রিন্টেড প্রেসক্রিপশনেও বাধ্যতামূলক ভাবে উল্লেখ থাকে।

৩. সব বিভাগ ও থানাতে সাজাপ্রাপ্ত দুর্নীতিগ্রস্তদের ইলেক্ট্রনিক ডাটা ব্যাঙ্ক রাখা যাতে সরকারের সব বিভাগ ও জনসাধারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্তদের নাম ঠিকানা প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ জানতে পারে।

—কালিদাস চৌধুরী,
শিলচর, কাছাড়, অসম।

দেশের আইনের ঊর্ধ্বে এক ইমাম

কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মওলানা নূর রহমান বরকতি প্রায় নিয়মিত বিপদজনক রকমের ফতোয়া ঘোষণার বাড়াবাড়ি করে চলেছেন যা সর্বপ্রকার শালীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের পরিসীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে।

সবচাইতে আশ্চর্য এবং অবাক হওয়ার মতো ঘটনা যখন দেখি রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী এবং তাঁর প্রশাসন ও তার দল এই বিষয়ে এক হিমশীতল নীরবতা অবলম্বন করে।

কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের এক বিজেপি যুব নেতা যোগেশ ভার্সনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী সম্বন্ধে একটি অবাঞ্ছিত ও বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। তার প্রতিক্রিয়ায় বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সংবাদপত্র প্রভৃতি আলোড়িত হয়। অথচ ইমাম বরকতির বেলায় এক যাত্রায় পৃথক ফল দেখা দিচ্ছে কেন সেটা বোঝা খুবই কষ্টকর। এরফলে একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায় তাহলো ক্ষমতার আসনে গদীয়ান হয়ে থাকতে গেলে এই তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চটালে চলবে না, তাদেরকে মাত্রাহীন তোষণ করে যেতে হবে।

এইসব ইমামদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উস্কানিমূলক ফতোয়ায় রাজ্যের চর্তুদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান মাদ্রাসা মক্তবগুলির ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হিংসামূলক শিক্ষার প্রতিক্রিয়ায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি এক বারুদের স্তূপে বসে আছে বললে কম বলা হয়। বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের সঙ্গে মৌলবাদী জঙ্গি, দেশবিরোধী শক্তির গোপন ক্রিয়াকলাপ যে প্রকাশ্যে চলে এসেছিল তা ভাসমান হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এরপর পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে একের পর এক তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উগ্র জঙ্গি রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল। এর ফলে আজ বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। এই কারণেই এবছর রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে এত বৃহত্তর সংখ্যায় হিন্দু-সমাজের একাংশ পথে নেমে এসেছিলেন। তার মধ্যে সশস্ত্র শোভাযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনেক স্থানে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে রাজ্য প্রশাসন এই বিষয়টির মোকাবিলায় সঙ্কীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির রঙিন চশমা পরে দণ্ডদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী বলেছিলেন, 'মিলন হয় সমানে সমানে, সবলে দুর্বলে কদাচ নয়। মুসলমান ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘু হলেও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। হিন্দু সংখ্যায় অধিক হলেও অসংগঠিত এবং দুর্বল। হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন যত শীঘ্র গড়ে উঠবে হিন্দু- মুসলমান মিলন তত দ্রুত হবে।' আজ তাই এইরকম এক পরিস্থিতিতে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়োচিত।

—কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী,
উত্তরপাড়া, হুগলী।

বরকতিকে ঘিরে তোষণ নীতি

টিপু সুলতান মসজিদের 'প্রাক্তন ইমাম' সৈয়দ নূর রহমান বরকতিকে নিয়ে গণ্ডগোল অব্যাহত। ঘটনা হলো, এই সমস্ত হইচই চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী একবারের জন্যেও কোনো শব্দ উচ্চারণ করেননি। সারা রাজ্যে যখন ক্রমশ শাসকদলের তোষণকারী চেহারা নিয়ে নিন্দের ঝড় বইতে শুরু করেছে তখন মুখ্যমন্ত্রী মুখ বন্ধ রাখলেও, ভিতরের বিদ্রোহ ঠেকাতে ঘুরিয়ে বরকতিকে থামাতে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ও তোষণের রাজনীতি যে ক্ষতি করছে মুখ্যমন্ত্রী তা বুঝলেও কীভাবে তা সামাল দেবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন কী? উত্তর হলো, তিনি বুঝেও চোখ বন্ধ করে রাখাটাই বেছে নিয়েছেন। তিরিশ শতাংশ ভোটের জন্য তিনি তোষণকেই হাতিয়ার করেছেন। তা না হলে, কলকাতার বুকে একটা উর্দু খবরের কাগজের সদর দপ্তরে অস্ত্র সমেত হানাহানির লিখিত অভিযোগ হলেও পুলিশ এখনও কোনো পদক্ষেপ করেনি। কেন করেনি সেই ব্যাখ্যা না জানালেও, সকলেই তা বুঝতে পারছে।

এমনকী নিজের দলের সিদ্দিকুল্লা অন্য সংগঠনের ব্যানার নিয়ে দিব্যি প্রতিবাদ চালিয়ে গেলেও একবারও একটাও শব্দ উচ্চারণ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। ফলে, তোষণ রাজনীতিতেই সওয়ার হয়ে চলতেই পছন্দ করেন তা স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

—শ্রীরূপা পত্রনবিশ,
কলকাতা-৯১।

বাংলার রক্ষক গোপাল মুখার্জি

সময়টা ১৯৪৬ সাল। দেশভাগ হলো বলে। কলকাতার দায়িত্বে মুসলিম লিগ। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি। একটা আগাপাশতলা মুসলিম নচ্ছার। ১৫ আগস্টের ঠিক পরের দিন ১৬ আগস্ট। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। এইদিন ভোরবেলা মুসলমানরা ধর্মতলায় হাজির হলো। শুরু হলো হিন্দু কাটা। আল্লাহু আকবর শব্দে ভরে গেল চারিপাশ, জ্বলতে লাগলো হিন্দুদের সম্পত্তি। রাজাবাজার স্কুলের সামনে চারটি মেয়েকে রেপ করে উলঙ্গ করে লটকে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিভৎসতা যে দেখেছে সে জানে। সারাদিন ধরে অজস্র ঘটনার অভিযোগ থানায় জমা পড়ল কিন্তু পুলিশ কোনো স্টেপ নিল না। এভাবে তিনটা দিন কেটে গেল। হিন্দুর লাশে কলকাতা ভরে গেল। যে কজন বামপন্থী নেতা পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লিগের পাশে দাঁড়িয়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায় তারাও হতভম্ব হয়ে গেল। কোনো বিজেপি বা আর এস এস-এর পিছনে ছিল না। এর জন্য কংগ্রেসের তোষণ নীতি দায়ী ছিল।

কিন্তু গোপাল মুখার্জি না থাকলে লাগাতার হিন্দু নিধন চলতেই থাকত। গোপালবাবুর কলেজস্ট্রিটে একটা বুচার শপ ছিল। তাই তাকে গোপাল পাঁঠা বলেও ডাকা হোত। তার কাছে ছিল কিছু পিস্তল, বোমা ও সোর্ড। এইগুলি কখনো কোনো অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করেনি গোপাল। এখন সেগুলো কাজে লাগালো সে। সে অরবিন্দের ভাবশিষ্য ছিল। রদা কোম্পানির অস্ত্রাগার লুঠ করেছিল গোপাল ও তার দলবল। সমস্ত হিন্দুরা গোপালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এদেশে আসা আমেরিকান সৈন্যদের বোতল বোতল হুইস্কির বিনিময়ে আরো কিছু অস্ত্র জোগাড় হলো। তারপর শুরু হলো লড়াই। নিয়ম ছিল নিরস্ত্র মুসলমানদের আর মেয়েদের মারা হবে না। সশস্ত্র মুসলমানদের মারা হবে। তিনদিনে এত মুসলমান মরলো যে সুরাবর্দির বাহিনীতে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে গেল। যেহেতু হিন্দুরা গোপালের পাশে ছিল তাই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সাহস পায়নি।

সুরাবর্দির মেয়ের এক শিক্ষক ছিলেন হরেন ঘোষ। তিনি ওর মেয়ের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে সুরাবর্দি বাহিনী কলকাতার মেজর পয়েন্টগুলো বোম চার্জ করে উড়িয়ে দেবার প্ল্যান করছে। এই মেজর পয়েন্টগুলি হলো : হাওড়া ব্রিজ, টালার জল টাঙ্কি, ভিক্টোরিয়া, শিয়ালদা স্টেশন ইত্যাদি। গোপালের বাহিনী প্রতিটা জায়গার দখল নেয়। পুলিশ বেগতিক দেখে সেই জায়গাগুলির দখল নিল। সুরাবর্দির সন্দেহ গিয়ে পড়ল হরেনবাবুর উপর। তাকে মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। তার শরীর কেটে ছয় টুকরো করা হলো।

কংগ্রেসী নেতারা এতদিন ঘাপটি মেরে ছিল। যেই মুসলমান মারা শুরু হলো, অমনি সবাই বেরিয়ে এলো। গান্ধী বেরিয়ে এলো শয্যাসঙ্গিনীদের ছেড়ে আর নেহরু বেরুলো এডুইনার বেডরুম থেকে। সবাই মিলে গোপালকে গান্ধীর সামনে নিয়ে এলো। গান্ধী তাকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বললেন। গোপাল বললেন, এতদিন আপনি ঘুমাচ্ছিলেন যখন হিন্দু মরছিল। আমি আপনার কথা রাখতে পারব না। অস্ত্র যদি ত্যাগ করতে হয় নেতাজী সুভাষ আসছে, তার কাছে ত্যাগ করব। বেগতিক দেখে সুরাবর্দি আপোস করে নিল। বলল, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। প্রশাসন কড়া হলো। ধীরে ধীরে সব কিছু থেমে গেল। বেঁচে গেল কলকাতা। কিন্তু নোয়াখালী বাঁচলো না। কারণ সেখানে গোপাল পাঁঠার মতো কেউ ছিল না। এই বাংলার রক্ষক গোপাল পাঁঠাকে নিয়ে কেউ লেখে না। ইনি না থাকলে বাংলা সেদিন পাকিস্তান হোত।

—অর্ণব কুমার ব্যানার্জী,
লেকটাউন, কলকাতা-৪৭।

দুর্বলতা ও ভয় নিরসনে গীতার দু'টি মহাবাক্য

সুনীল কুমার দাস

পাণ্ডব পক্ষের প্রধান যোদ্ধা অর্জুন যুদ্ধ করতে এসে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভয় তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল। স্বজন হারানোর ভয়। যুদ্ধ জিততে হলে গুরু দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম সহ পূজ্যপাদ গুরুজনদের হত্যা করতে হবে, এই ভয়। আবার পাপেরও ভয়। কারণ কুটুম্বাদি গুরুজনদের হত্যা করলে পাপ হওয়ার সম্ভাবনা। এই সমস্ত ভয় তখন তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। তারপরেও ছিল এই যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা। সবাইকে হত্যা করে তিনি কীভাবে সুখী হবেন? এই দুর্ভাবনা, তাঁকে শেষ পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলেছিল। একদিকে কর্তব্যের গুরুভার, অন্যদিকে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের ভীষণ দোলাচল। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব থেকে গীতার সূত্রপাত। এভাবেই জন্ম হলো অদ্বৈততত্ত্বরূপিনী, অমৃতবর্ষিণী ভগবতী গীতার। শোনা গেল শ্রীভগবানের অলৌকিক দিব্যবার্তা। গীতার প্রথম মহাবাক্য। মহাভয় নিরসনের জন্য দিশাহারা অর্জুনকে শ্রীভগবানের প্রথম উপদেশ। বলা যেতে পারে, কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনের এই মোহ-ভাবকে উপলক্ষ করে মানব-জাতির হিতার্থে তাঁর প্রথম দিব্যবাণী—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গমকীর্তিকরমর্জুন।। ২/২

হে অর্জুন, এই বিষম সঙ্কটকালে অনার্য জনোচিত, অকল্যাণকর তোমার এই মোহ কোথা থেকে উপস্থিত হলো? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এরকম আচরণ করেন না। এটা কাপুরুষতা।

আজ দেশজুড়ে দুর্যোধনদের ভীষণ দৌরাত্ম্য আর হাজার হাজার অর্জুনদের এই পলায়নপর মনোবৃত্তি, শ্রীভগবানের সেই বাণীকেই আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। অর্জুনও পালাতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধ না করাটাই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি জানতেন অর্জুন মহাযোদ্ধা ও নীতিপরায়ণ মানুষ। তথাপি কোনো এক অজানা কারণে তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ভেঙে পড়েছে তাঁর তেজোদীপ্ত সাহসী মন। তিনি তখন নেহাতই সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করছেন। একটা অজানা ভয়, একটা দুর্বলতা তাঁকে পেয়ে বসেছে। আত্মশক্তিহীন, নির্বীর্য, তামসিক মানুষ যেমন পশুতুল্য হয়ে পড়ে, মরণদশা প্রাপ্ত হয়, অর্জুনও তাই হয়েছিলেন। এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা তাঁকে পুনরায় তাঁর আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি যে মহাযোদ্ধা, অতুল পরাক্রমী সেই কথাটি তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আত্মশক্তি, যে পারমার্থিক দিব্যসত্তা আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেদিকেই তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তিনি অর্জুনকে ঠিক সেই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। ২/৩

হে অর্জুন, ক্লীবতা ত্যাগ কর। কাপুরুতা ত্যাগ কর। এরকম নপুংসক আচরণ তোমার শোভা পায় না। তুমি বীর। উঠে দাঁড়াও। তোমার শত্রুদের যুদ্ধে পরাস্ত কর।

এ দু'টিই গীতার মহাবাক্য— জগতের সমস্ত জ্ঞান ও নীতির মূল কথা। স্বামী বিবেকানন্দের মতে— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই একটি মাত্র বক্তব্যেই গীতার সমগ্র ভাবটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখন জানা গেল পাপের উৎস মূল কোথায়! এও বোঝা গেল দুর্বলতাই সমস্ত বিপত্তির মূল কারণ। তাহলে তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় কী? কেমন করে আমরা দুর্বলতা মুক্ত হব? কেমন করে আমরা ভয় জয় করে সাহসী হয়ে উঠবো? আসলে— দুর্বলতা ও স্বার্থপরতা একই মুদ্রার দুইটি দিক। আমরা যখন স্বার্থপর হই, তখন দুর্বল হয়ে পড়ি। আমরা যখন মিথ্যার বশীভূত হই, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসার বশীভূত হই— তখনই আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। আমরা যখন আত্মকেন্দ্রিক ও দেহবুদ্ধির শিকার হই— কেবল তখনই আমরা দুর্বলতাযুক্ত হই। কিন্তু আমরা যখন পরার্থপর হই, প্রেমপূর্ণ, সত্যপরায়ণ ও নীতিযুক্ত হই, দেহাত্মবুদ্ধির পরিবর্তে আমাদের মধ্যে যখন দেহাত্মবিবেক জেগে ওঠে, তখনই আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। আমরা তখন ভয় জয় করে সাহসী হয়ে উঠি।

প্রতিটি মানুষেরই প্রকৃত শক্তি, তার আত্মশক্তি। মানুষ আত্মশক্তি বলেই জগৎ জয় করতে পারে। আমরা এই আত্মশক্তির অভাবেই ক্রমশঃ নির্বীর্য হয়ে পড়ছি। আমাদের ঘরেই গীতার দ্যুতি। অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার। তথাপি ভিখারির দশা প্রাপ্ত হয়েছি। সিংহশাবক হয়ে মেষ তুল্য আচরণ করছি। অর্জুনও দুর্বলতার শিকার হয়েছিলেন। গুরুজন বধে পাপ হবে এই ভ্রান্তি তাঁকেও মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল। যত দেহবুদ্ধি ও স্বার্থ-চিন্তার স্রোতে অভিভূত হয়ে এক সময় তিনিও ভাবতে শুরু করেছিলেন, আত্মীয়-স্বজনদের বিনাশ করে তিনি কীভাবে সুখী হবেন? অবশ্য অর্জুনের মোহভঙ্গ হয়েছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তাকে আত্মস্থ করল। তিনি আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে আবারও ধ্বনিত হলো পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ। সেই বিপুল শঙ্খনাদ বীরের হৃদয়কে জাগ্রত করল। হৃদয়ের দরজা খুললে অকপট শুদ্ধ মনের অধিকারী হলে সবাই শুনতে পাবেন সেই দিব্য অলৌকিক শঙ্খধ্বনি।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)

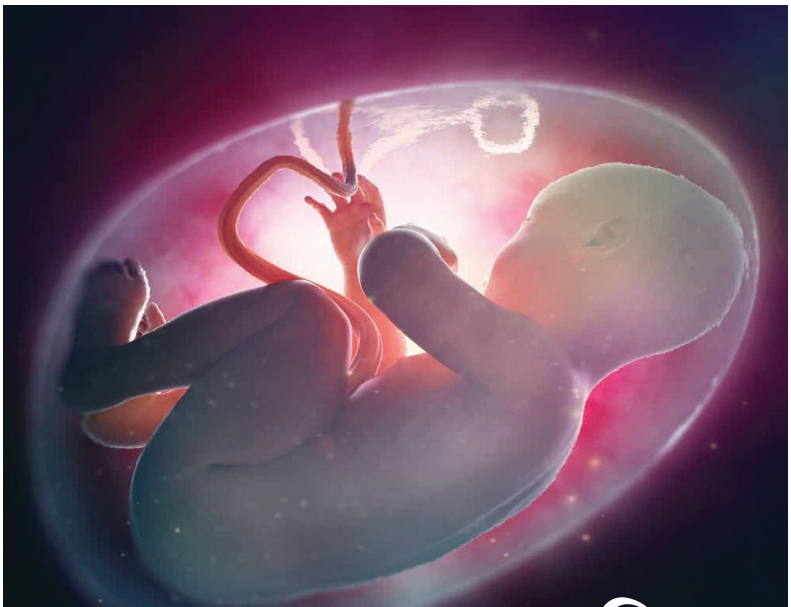

বাবা-মা'র সংস্কার শিশু প্রথম পায় মাতৃজঠরে

স্বপন দাস

আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান সন্ততি মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠুক। তার মধ্যে থাকুক আমাদের জাতির ঐতিহ্যের গৌরব, শিক্ষার আলোকে বিচ্ছুরিত হওয়ার প্রবণতা। আমরা সবাই চেষ্টা করি সেই পথে আমাদের সন্তানকে চালিত করতে। কিন্তু সেই শিক্ষা আমরা কবে থেকে দেব? কোন বয়স থেকে সে নিতে পারবে সেই শিক্ষা? আমরা প্রতিনিয়ত ভেবে চলি মনে মনে, আর সমাধান করার চেষ্টা করি। এই সমস্যার সমাধান কী করে করা যায়, তা নিয়ে সারা বিশ্বে নিরন্তর গবেষণা চলছে। এই গবেষণার ফলও মিলছে। গবেষকরা দেখেছেন যে একটি শিশু যখন মাতৃজঠরে থাকে, সেই সময়ে বেশ কিছু সংস্কার সে অবস্থাতেই গ্রহণ করে। এটাকে তাঁরা বলেছেন গর্ভস্থ অবস্থায় শিক্ষা (প্রি ন্যাটাল লার্নিং)। এর প্রমাণ তো আমরা আমাদের মহাভারতেই পেয়েছি। অর্জুন-সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যুর ক্ষেত্রে। অভিমন্যু মাতৃ জঠরে থাকার সময়ে তার মাতা পিতা নানা আলোচনার মাঝে যুদ্ধ কৌশল নিয়েও আলোচনা করতেন। আর সেই সময়েই অভিমন্যু শিখেছিলেন চক্রব্যূহে (পদ্মব্যূহ) প্রবেশ করার কৌশল। কিন্তু সেই ব্যূহ থেকে বের হবার কৌশল তার আয়ত্ত হয়নি, কারণ সেটি আলোচিত হয়নি সেই সময়ে। ফলে অভিমন্যুর সেই শিক্ষা লাভ সম্ভব হয়নি। সেই কারণে অভিমন্যুকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এখানেই বনপর্বে আছে আর একটি কাহিনি। আমরা বেদজ্ঞ ও সর্ব জ্ঞানে জ্ঞানী পণ্ডিত ঋষি অষ্টবক্রর কথা জানি সবাই। তিনি মাতৃজঠরে থাকার সময়ে তাঁর পিতামহ ও পিতার কাছ থেকে শুনেছিলেন বেদের সুমধুর আবৃত্তি। সেই শুনে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বেদ।

ভক্ত প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু গভীর অরণ্যে ধ্যানে মগ্ন। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র কোনো এক কারণে দৈত্য বিনাশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সেই সময়ে তিনি জানতে পারলেন, যে হিরণ্যকশিপুর পত্নী সন্তানসম্ভবা। তিনি এও ভাবলেন, যে অচিরেই আরো একটি দৈত্যের পৃথিবীতে আগমন ঘটবে। সেই কারণে, তিনি হিরণ্যকশিপু স্ত্রী-কে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এই সময়েই দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন, 'তিনি জানালেন, যে ওই সন্তান হবে ধার্মিক ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নারদ আরও বলেন, ভক্ত প্রহ্লাদ হলেন বিষ্ণুর অবতার। তাঁর এই বিষ্ণুর প্রতি যাবতীয় অনুরাগ এসেছে মাতৃজঠরে থাকার সময়েই। প্রহ্লাদ মাতৃজঠরে থাকাকালীন দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে শুনতেন বিষ্ণু ভক্তিগীত। আর সেই থেকেই তার বিষ্ণুভক্তির গাঢ় অনুরাগ। আমরা বেদান্তে কপিলার কথা জানি। জ্ঞানী কপিলাও মাতা দেবাহুতির জঠরে থাকার সময়েই শুনেছিলেন বেদান্তের নানা কথা। আর তিনি ভূমিষ্ঠ হবার সেই সব কাহিনি, বেদান্তের পাঠ দিয়েছিলেন মা'কে।

এই বিষয়ে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে আরোগ্য ভারতী দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। তাদের গর্ভবিজ্ঞান সংস্কার প্রকল্পের কাজ প্রায় এক দশক আগে শুরু হয়েছে গুজরাটে। ২০১৫ সালে এই প্রকল্প বিস্তারলাভ করে সারা ভারতে। এই গর্ভ বিজ্ঞান সংস্কারের প্রস্তাবনায় বলাই হয়েছে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উত্তম সন্তানলাভের সম্ভাবনা। সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও এই বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিল আরোগ্য ভারতী। কলকাতা হাজরা পার্কের কাছে একল ভবনে। এই আয়োজন করতে গিয়ে শত বাধা এসেছিল রাজ্য সরকারের অধীনস্থ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস্'-এর কাছ থেকে। একটি জনস্বার্থ মামলাও হয়। বাধা আসে বামপন্থীদের কাছ থেকে। উচ্চ আদালত কিছু সীমারেখা টেনে দেয়। ৬২টি দম্পতিকে নিয়ে সেমিনারের মাধ্যমে আয়োজিত হয় প্রাচীন বিজ্ঞানের এই ধারা। সেই প্রাচীন বিজ্ঞান অনুসারে সন্তানের জন্মদানে ইচ্ছুক দম্পতিদের তিন মাসের শুদ্ধিকরণ, গ্রহ-নক্ষত্রের শাস্ত্র নির্দিষ্ট অনুযায়ী শারীরিক মিলন সম্পর্কিত নানা বিধি মানলেই সুন্দর মেধাবী স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে। সেটিই সেমিনারের আলোচ্য হয়ে ওঠে। সকলেই চান সুসন্তানের বাবা-মা হতে। তারজন্য গর্ভসংস্কার এবং গর্ভস্থ অবস্থায় শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। জার্মানিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই সুফল মিলেছে। ভারতেও অবিলম্বে এর প্রয়োগ প্রয়োজন। ■

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-কন্যা

দেবপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারতের এক অসামান্য চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র। এক জন্মান্ধ ব্যক্তি তথা জন্মান্ধ পিতার মানসিক দ্বন্দ্ব ও অভিব্যক্তি প্রতিভাত হয়েছে এই চরিত্রের মাধ্যমে। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র ব্যাসদেবের এক অভিনব সৃষ্টি সন্দেহ নেই। অনেকে অভিযোগ করেন মহাভারতের কাহিনি কাল্পনিক, অতিরঞ্জিত, অবিশ্বাস্য। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন আমরা আলোচনা করি সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কীভাবে এত চরিত্র ও তাদের কাহিনি উপস্থাপিত করেছেন মহাভারতে। আরও আশ্চর্য হতে হয় প্রত্যেকটি চরিত্র স্ব স্ব মহিমা ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর আর মনুষ্যচরিত্রের প্রত্যেকটি দিক, চিন্তা, ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। মনে হয় যেন প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটেছে তাঁর চোখের সামনে। তাই এতো জীবন্ত তাঁর উপস্থাপনা আর ঘটনার বিন্যাসও সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একশো পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। যদি আধুনিককালের কোনো বিশেষ প্রতিভাবান স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আচ্ছা বলুন তো, ওই একশো পুত্র ও এক কন্যার নাম কী? তবে নিশ্চয়ই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হবেন সন্দেহ নেই।

মহাভারতের আদিপর্বের ৬৭তম এবং ১১৭তম অধ্যায়ে আমরা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্র ও একটি কন্যার নাম পেয়ে থাকি। ৬৭তম অধ্যায় ও ১১৭তম অধ্যায়ের নামগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এতে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু তৎকালে এক একজনের একাধিক নাম ছিল, সেই হিসেবে ওইরূপ নামের পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে আদিপর্বের উপরোক্ত দুটি অধ্যায়েই মহারাজ জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন যেভাবে নামগুলি উপস্থাপিত করেছেন সেইভাবে তা নিম্নে বর্ণিত হলো।

(১) দুর্যোধন, (২) দুঃশাসন, (৩) দুঃসহ, (৪) দুঃশল, (৫) জলগন্ধ, (৬) সম, (৭) সহ, (৮) বিন্ধ, (৯) অনুবিন্ধ, (১০) দুর্ধর্ষ, (১১) সুবাহু, (১২) দুষ্প্রধর্ষ, (১৮) দুর্মষণ, (১৪) দুর্মুখ, (১৫) দুষ্কর্ণ, (১৬) কর্ণ, (১৭) বিবিংশতি, (১৮) বিকর্ণ, (১৯) সুলোচন, (২০) চিত্র, (২১) উপচিত্র, (২২) চিত্রাক্ষ, (২৩) চারুচিত্র, (২৪) দুর্মদ, (২৫) দুর্বিগাহ, (২৬) বিবিৎসু, (২৭) বিকটানন, (২৮) ঊর্ণনাভ, (২৯) সুনাভ, (৩০) নন্দ, (৩১) উপনন্দক, (৩২) চিত্রবান, (৩৩) চিত্রবর্মা, (৩৪) সুবর্মা, (৩৫) দুর্বিমোচন, (৩৬) অয়োবাহু, (৩৭) মহাবাহু, (৩৮) চিত্রাঙ্গ, (৩৯) চিত্রকুণ্ডল, (৪০) ভীমবেগ, (৪১) ভীমবল, (৪২) বলাকী, (৪৩) বলবর্ধন, (৪৪) উগ্রাযুধ, (৪৫) সুসেন, (৪৬) কুণ্ডোদর, (৪৭) মহোদর, (৪৮) চিত্রাযুধ, (৪৯) নিষঙ্গী, (৫০) পাশী, (৫১) বৃন্দারক, (৫২) দৃঢ়বর্মা, (৫৩) দৃঢ়ক্ষেত্র, (৫৪) সোমকীর্তি, (৫৫) অনুদর, (৫৬) দৃঢ়সন্ধ, (৫৭) জরাসন্ধ, (৫৮) সত্যসন্ধ, (৫৯) সহস্রবাক্ (৬০) উগ্রশ্রবা, (৬১) উগ্রসেন, (৬২) সেনানী, (৬৩) দুষ্পরাজয়, (৬৪) অপরাজিত, (৬৫) কুণ্ডশায়ী, (৬৬) বিশালাক্ষ, (৬৭) দুরধর, (৬৮) দৃঢ়হস্ত, (৬৯) সুহস্ত, (৭০) বাতবেগ, (৭১) সুবর্চস, (৭২) আদিত্যকেতু, (৭৩) বহ্বাশী, (৭৪) নাগদত্ত, (৭৫) অগ্রযায়ী, (৭৬) কবচী, (৭৭) ক্রথন, (৭৮) কুণ্ডী (৭৯) কুণ্ডধার, (৮০) ধনুর্ধর, (৮১) উগ্র, (৮২) ভীমরথ, (৮৩) বীরবাহু, (৮৪) অলোলুপ, (৮৫) অভয়, (৮৬) রৌদ্রকর্মা, (৮৭) দৃঢ়রথ, (৮৮) অনাধৃষ্য, (৮৯) কুণ্ডভেদী, (৯০) বিরাবী, (৯১) দীর্ঘলোচন, (৯২) প্রমথ, (৯৩) প্রমাথী, (৯৪) দীর্ঘরোম, (৯৫) দীর্ঘবাহু, (৯৬) মহাবাহু, (৯৭) ব্যূরোরু, (৯৮) কনকধ্বজ, (৯৯) কুণ্ডজ, (১০০) চিত্রক।

এক কন্যার নাম দুঃশলা।

আদি পর্বের ৬৭তম অধ্যায় ও ১১৭তম অধ্যায়ের নামগুলির অর্থ ও পারম্পর্য বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেকটি নামই যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। অর্থের পার্থক্য হেতু নামের কিছু তারতম্য হয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। এক কন্যার নাম দুঃশলা।

শতপুত্র ছাড়া এক বৈশ্য পরিচারিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র যুযুৎসু নামে এক মহাতেজস্বী ধর্মজ্ঞ পুত্রের জন্ম দান করেন। যুযুৎসু-জননী ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহিতা ভার্যা ছিলেন না, তিনি রাজপরিবারে ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যজাতীয়া পরিচারিকা ছিলেন। এই যুযুৎসু সত্যপ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি অধর্ম পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করেন। আর লক্ষ্যণীয় ওই একমাত্র কৌরব বা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যিনি ভারতযুদ্ধে জীবিত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অপর শতপুত্রের সকলেই ভীমের হাতে নিহত হন।

ঋণস্বীকার :

মহাভারত --- কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত --- পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, মহাভারতের চরিত্রাবলী— শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য।

পরিবেশ রক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন যেরূপেই দেখি না কেন, নারী প্রায় সব পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজমান। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জীবনে তাঁর প্রভাব সীমাহীন। সেই কারণে একজন মহিলা যেভাবে তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তা অন্যদের কাছেও দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, তাঁকে যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গেই দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে হয়।

স্টেট কাউন্সিল অব্ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এস সি আর টি)-এর স্টেট কোঅর্ডিনেটর তথা ডেপুটি ডাইরেক্টর (পঞ্জাব) ড. শ্রুতি শুক্লা বলেন, ইতিহাস সাক্ষী, যখনই মহিলারা কোনো আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, সেই আন্দোলন সফল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গাছ বাঁচানোর জন্য চিপ্‌কো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদি। এই আন্দোলনগুলিতে মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহিলারা কর্মরতা বা ঘরোয়া যেরকমই হোন না কেন, তাঁরা যদি জল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালন করেন, তাহলে মানুষ এখনকার থেকে অনেক ভাল অবস্থায় প্রকৃতি এবং পরিবেশকে পেতে পারে। মহিলাদের ওপর আশা অনেক বেশি। কারণ তাঁদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ এবং দায়িত্বশীলতার মতো গুণ বর্তমান। এর সাহায্যেই তাঁরা নিজেদের কর্তব্য সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন।

মহিলারা তাঁদের নিজস্ব প্রাত্যহিক কাজের মাধ্যমে প্রকৃতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। বাড়ির জরুরি জিনিসপত্র কেনাকাটার বেশিরভাগ তাঁরাই করেন, সেজন্য পৃথিবী রক্ষার্থে তাঁদের সবুজ উপভোক্তা (গ্রিন কন্‌জ্যুমার) হতে হবে; অর্থাৎ তাঁরা এমনসব জিনিস কেনার চেষ্টা করবেন, যা তৈরি করতে বা ব্যবহার করার সময় পরিবেশের বিশেষ

অঙ্গনা

কোনো ক্ষতি হবে না, অথবা যেসব জিনিসের প্যাকিংয়ে খুবই কম প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে বা যেগুলি রি-সাইকিল্ড বস্তু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ডিস্পোজেবেল জিনিসের ব্যবহার খুবই কম বা না করলেই ভাল; যেমন— ইউজ অ্যান্ড থ্রো কলমের পরিবর্তে রিফিল বদল করা যায় এরকম কলম ব্যবহার করা যায়। রুটি রাখার জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের পরিবর্তে কাগজের তৈরি রুমাল ব্যবহার করা যায়। ছোট ছোট প্যাকেটের বদলে বড় প্যাকেটের জিনিস কিনলে অর্থের সাশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ওপর থেকে জঞ্জালের বোঝাও একটু কম হয়।

মহিলারা যদি নিজেদের বাড়ির পরিবেশের রক্ষাকর্ত্রী হয়ে প্রকৃতির রক্ষা করেন, তাহলে স্বচ্ছ ভারত অভিযান তো সফল হবেই, তার সঙ্গে আমাদের পরিবেশও আগামী প্রজন্মের জন্য আরও বেশি সুরক্ষিত হবে। এজন্য সবার আগে মনস্থির করতে হবে যে বাড়ির আবর্জনা যেখানে-সেখানে ফেলব না। সবুজ আবর্জনা অর্থাৎ ফল বা সবজির খোসা সম্ভব হলে বাড়ির কাছে গর্ত করে তাতে জমা করলে চমৎকার কম্পোষ্ট সার তৈরি হয়ে যাবে— যা গাছগাছালির জন্য খুবই উপকারী। এতে বাড়ির মোট জঞ্জালের পরিমাণও কমে যাবে।

প্লাস্টিকের ব্যবহার কম করা উচিত। প্লাস্টিকের আবর্জনা নষ্ট হতে ২০ থেকে ১০০০ বছর সময় লাগে। সেজন্য এব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। বাজারে কেনাকাটার সময় প্লস্টিকের পরিবর্তে কাগজের ঠোঙা বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কম হলে আবর্জনাতেও প্লাস্টিকের পরিমাণ কমে যাবে। বাজার যাবার সময় নিজেদের থলে সঙ্গে নিয়ে গেলে প্লাস্টিকের ব্যাগ বাড়িতে আসবে না।

বাসনমাজা বা কাপড় ধোয়ার সময় রাসায়নিক ডিটারজেন্টের পরিবর্তে গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা ভাল। প্রয়োজনমতো কাপড় ধোয়ার অভ্যেস তৈরি করা উচিত। বাসনও হিসেব করে ব্যবহার করলে সাবান, জল এবং অর্থ সবেরই খরচ কম হয় আর অনাবশ্যক পরিশ্রম থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

যতটা সম্ভব গাছপালা বা প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকলে শরীর মন দুই-ই ভাল থাকে। বাড়ির আশেপাশে ছাতে, বারান্দায় গাছপালা লাগানো এবং তার পরিচর্যা করা খুবই ভাল অভ্যেস। বৈদ্যুতিক উপকরণের ব্যবহার প্রয়োজন মতো করাই ভাল। যত বেশি ব্যবহার, তত বেশি গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বাল্বের পরিবর্তে এল-ই-ডি লাগানো ভাল। বাড়ির লোকজন একসঙ্গে একই ঘরে বসে সময় কাটালে আলাদা আলাদা ঘরে আলো, পাখা, এসি ইত্যাদি ব্যবহার কম হবে।

মহিলারা যদি নিজ দায়িত্বে বাড়ির চারপাশে সবুজ বাতাবরণ তৈরি করতে সচেষ্ট হন, তাহলে অসহ্য গরমের হাত থেকেও অনেকটা রেহাই পাবেন। বড় বড় ছায়া এবং ফল দেওয়া গাছ যথেষ্ট পরিমাণে লাগালে, তা কোনো শহরের তাপমাত্রা ৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত কম করতে পারে। এভাবে মহিলারা পরিবেশ রক্ষায় অন্যদের দৃষ্টান্ত হতে পারেন। ■

রোগ নিরাময়ে ডান্স থেরাপি

কেকা মজুমদার

নৃত্য অঙ্গ ও ভাবের সৌন্দর্যময় ভাষা। হাস্য, শোক আদি ভাবের উৎপত্তি মানব জাতির জন্মের সঙ্গেই প্রাপ্ত হয়। মানব জাতির জন্ম ও ভাবের প্রকাশ সমকালীন। নৃত্যের ইতিহাসও ততোধিক প্রাচীন। শারীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সূত্রে বিশ্বাসী বিদ্বানরা সভ্যতার বিকাশে নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকার করেন। বিলম্ব বুণ্ড-এর মতানুসারে মানব জাতির সৃষ্টির প্রারম্ভে নৃত্যই তার অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম ছিল। তখন মানুষ মানবীয় উদ্যোগ তথা ভাবনা, হস্ত সঞ্চালন, মুখের বিভিন্ন আকৃতি, সমস্ত শরীর তথা অন্য অবয়ব এদিক ওদিক সঞ্চালন করে নিজ অভিব্যক্তি প্রকাশ করত। অতএব নৃত্য দ্বারাই এরা এদের মনের ভাব প্রকাশ করত, যা মানব জাতির বিকাশের অন্য দ্বার উন্মোচন করেছিল। এই দ্বার মানুষের হৃদয় ও মানসিক স্থিতিকে তৃপ্ত করেছিল।

যখন লেখ্য ভাষার প্রচলন হয়নি, তখন মানুষ পৌরাণিক আখ্যানগুলি নৃত্যের মাধ্যমেই বংশ পরম্পরায় প্রচার করতেন। কথিত আছে ডাইনিরা নৃত্যের মাধ্যমে অসুস্থ মানুষের শরীর থেকে অশুভ আত্মাকে অপসারিত করত। নৃত্যের মধ্যে যে যাদু আছে তা প্রাচীন মানুষেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস বর্তমান যুগের আধুনিক মানবজাতির মনে পুনরায় ফিরে এসেছে। মধ্যযুগে প্লেগরোগ প্রতিরোধের জন্য নৃত্য ব্যবহৃত হোত। শোনা যায় ইতালির টারান্টালা নৃত্য অত্যধিক এক বিষাক্ত মাকড়শার বিষদংশন থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রাচীন মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, মহামারি প্রভৃতি রোধ করার জন্যও নৃত্যকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিত। এছাড়া গোষ্ঠীগত ও সামাজিক সংহতি সৃষ্টিরও হাতিয়ার ছিল নৃত্য। এইসব নৃত্য লোকনৃত্য হিসেবেই পরিচিত।

যন্ত্রনির্ভর নাগরিক সভ্যতা বিকাশের পর মানুষ ভুলে গেল সভ্যতা বিকাশে নৃত্যের মানবিক ও সামাজিক গুরুত্ব। বিংশ শতকের প্রথমদিকে নৃত্য বিষয়ে এক নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। কয়েকজন নৃত্যবিদ ও কোরিওগ্রাফার উপলব্ধি করলেন নৃত্য নিছকই এক শিল্পকর্ম নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে চিকিৎসকের গুপ্তমন্ত্র। বুঝতে পারলেন আমাদের মনের গভীরে আবেগ যা অবচেতনার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, নৃত্যের মাধ্যমে তার প্রকাশ সম্ভব। মানসিক ব্যাধিই শুধু নয়, অনেক পুরোনো অসুখ, এমনকি ক্যানসারের মতো মারণ রোগে আক্রান্ত রোগীকেও সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে সক্ষম এই শিল্প। মন যে মুক্তি পায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান-প্রদান যে সহজ হয়, সম্পর্ক যে সুদৃঢ় হয় এই মূল্যবান বিষয়টি বিংশ শতকের কিছু নৃত্যশিল্পী উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নটরাজ বিষয়ক নৃত্যোপযোগী সংগীতের মূলভাবও তাই।

সমকালীন মনোবিজ্ঞানীরা শরীর ও তার অ-বাক ভঙ্গিমাকে থেরাপির কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। উইলহেলম রেইখ উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা প্রভৃতি মনোরোগের বিরুদ্ধে শারীরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন। তিনি 'Muscular Manipulation' ব্যবহার করার রীতিও আবিষ্কার করেন। আলেকজান্ডার লাউয়েন প্রয়োগ করেন 'Bioenergetic'। নৃত্যের মাধ্যমে শরীর, মন ও আত্মার সংযোগ সাধনের প্রয়াস দেখা যায় বিংশ শতকের প্রথম দিকে— ইসাডোরা ডানকান, বুথ সেন্ট ডেনিস, ডরোসি হামফ্রে, মার্থা গ্রাহাম, হানাহোম প্রভৃতি নৃত্যবিদের মধ্যে।

আমেরিকার নর্তকী মারিয়ান চেসকে ডান্স থেরাপির 'Grand Dame' বলা হয়। এক পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তাঁর শিরদাঁড়া আঘাত প্রাপ্ত হয়। তার ফলে বসে থাকা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তখন তাঁর ডাক্তার তাঁকে নৃত্যকে জীবনে অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তার কারণ নৃত্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর শারীরিক অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ডাক্তারের পরামর্শ মারিয়ান চেস তাঁর জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। এরপর চেস তাঁর সমস্ত মনোযোগ নাচের মধ্যে অর্পণ করেন এবং অচিরেই তিনি এক দক্ষ শিল্পী ও কোরিওগ্রাফার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

মারিয়ান চেস তাঁর মৃত্যু অর্থাৎ ১৯ জুলাই ১৯৭০ পর্যন্ত নৃত্যকে থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করে গেলেন এবং অন্য মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য ADTA -এর প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৯৬৫ সালে আমেরিকান ডান্স থেরাপি অ্যাসোসিয়েশন ADTA-এর প্রতিষ্ঠা হয়। মারিয়ান চেস হন তার প্রথম সভাপতি। এই সংস্থাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে U.S. Department of Education, Indiridual with Disabilities Act, National Institute of mental health, National coalition of Pupile Service Organization ইত্যাদি। আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, গ্রিস, জার্মানি, ইতালি, স্কটল্যান্ড, কোরিয়া, জাপান, স্পেন, পেরু, চীন, ভারত প্রভৃতি পৃথিবীর ৪০টি দেশের ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসা করা হয় ডান্স থেরাপির মাধ্যমে।

ক্লাসরুমে দুর্গন্ধ, ছাত্রদের অভিনব সমাধান

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ তামিলনাড়ুর কুরুমবাপাত্তির পঞ্চায়েত মিডল স্কুলের ছাত্রদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন কিছুক্ষণ স্কুল চলার পর ক্লাসরুমে আর বসে থাকা যেত না। অসহ্য দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠত। দিনের পর দিন এই ভাবে কাটিয়ে ওরা বুঝতে পারছিল ওদের অসুখ-বিসুখ মারাত্মক বেড়ে গেছে। প্রায়শই জ্বর হয়। এছাড়া বমি-বমি ভাব, পেট ব্যথা। স্কুল না-যাওয়া লেগেই আছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী?

প্রথমে ওরা ভেবেছিল রোজ সাবান মেখে স্নান করলে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরলে আর চুল-টুল সাফসুতরো রাখলেই বোধহয় মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু নিজেদের সাফ করে কোনো লাভ হলো না। এই সময় স্কুল কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ডিজাইন ফর চেঞ্জ নামের একটি অবাণিজ্যিক সংগঠন ছাত্রদের মানসিক বিকাশের উদ্যোগ নেয়। সংস্থাটির ফিল-ইমাজিন-ডু-শেয়ার (ভাবনা-কল্পনা-প্রয়োগ-বিনিময়) নীতির সফল রূপায়ণ ছাত্রদের দুর্গন্ধের উৎস সন্ধানে মনোযোগী করে তোলে।

ছাত্ররা পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। পাঁচজনই সদ্য তেরো পেরিয়েছে। সুপিক পণ্ডিয়ান, সন্তোষ, ধিয়ানিতি, রাগুল এবং প্রবাহরণ। কমিটির সরেজমিন তদন্তে জানা গেল স্কুলের টয়লেট থেকে আসছে দুর্গন্ধটা। একটি অত্যন্ত অব্যবস্থিত টয়লেট যেখানে প্রস্রাব করার বেসিন পর্যন্ত নেই, সেখানে ছাত্ররা মেঝেতে প্রস্রাব করতে বাধ্য হোত। তারপর সেই প্রস্রাব মাড়িয়ে ফিরে আসত যে-যার ক্লাসরুমে। জুতোয় লেগে থাকা প্রস্রাব থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াত।

রোগ তো ধরা পড়ল, এখন ওষুধের কী ব্যবস্থা হবে! স্কুলের টয়লেটে প্রস্রাব করার বেসিন বসানোর খরচ অনেক। জীবনের বেশিরভাগ অভিনব আইডিয়ার জন্ম কিশোর বয়েসেই হয়। এরকমই একটি আইডিয়া দিল কমিটির এক সদস্য। কুড়ি লিটারের প্লাস্টিকের বোতল আড়াআড়ি ভাবে কেটে যে বেসিন বানানো যেতে পারে, এ বুদ্ধি তার। কথায় বলে, সেতু যে বাঁধে ঈশ্বর ঠিক তাকে একটা-না- একটা কাঠবেড়ালি জুটিয়ে দেন। ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দীপনা এক শিক্ষককে আকৃষ্ট করে। তাঁর নাম ডি. কেশবন। তিনি এগিয়ে এলেন। শুধু তিনিই নন। স্থানীয় এক পানীয় জল বিক্রেতা, যার দোকানে হরেক কিসিমের জলের বোতল দেখতে পাওয়া যায়, তিনি পুরনো-ব্যবহৃত বোতল দিয়ে সাহায্য করলেন। তার জন্য দাম তো নিলেনই না, উপরন্তু বোতল কীভাবে কাটতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন ছাত্রদের।

কাজ শুরু হলো। শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পাইপ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনা হলো। ছাত্ররা প্রথমে টয়লেটের কলি ফেরাল। ছিল ড্যাম্পের দাগ ধরা সাদা, হলো সবুজ। তারপর তৈরি করল নিকাশী ব্যবস্থা, যাতে প্রস্রাব সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। সব শেষে বসানো হলো প্লাস্টিকের বোতল কাটা বেসিন।

পঞ্চায়েত ইউনিয়ান মিডল স্কুলের ছাত্ররা এখন খুশি। কমিটির সদস্যদের চোখে বিশ্বজয়ের আনন্দ। তারা বলে, 'এই পদ্ধতি শুধু স্কুলে নয়, বাড়িতে বা জনবহুল স্থানেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে দুর্গন্ধ তো বটেই, নানারকম সংক্রমণজনিত অসুখ রোধ করা যায়। সব থেকে বড়ো কথা, এই পদ্ধতিতে সারাদেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলা যায়।' ■

আই ও এ-কে নিয়ে মনিটরিং কমিটি গড়ল কেন্দ্র

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগবীর সিংহ, অশ্বিনী নাচাপ্পা এবং খাজান সিংহ এদেশের ক্রীড়াজগতে অত্যন্ত সম্মানীয় তিন ক্রীড়াবিদ। হকি, অ্যাথলেটিক্স এবং সাঁতারে বহু কীর্তি গৌরবের অধিকারী জগবীর, অশ্বিনী এবং খাজান। জগবীর তো আবার বিশ্ব একাদশ দলেও খেলেছেন। খাজান সিংহ ৮৬-র সিওল এশিয়াডে রুপো জয়ী আর অশ্বিনী তাঁর সময়ে ভারতের দ্রুততম স্প্রিন্টার ছিলেন। সম্প্রতি এক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে খোলামেলা সাক্ষাৎকারে ভারতের ক্রীড়াসংস্কৃতি আন্দোলন ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তারই কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো।

□ সামনের বছর বিশ্বকাপ হকি, এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমস... ভারতের সম্ভাবনা কতটুকু?

জগবীর সিংহ— হকি ইন্ডিয়া এবং সাই দেশের হককে আবার বিশ্বমঞ্চে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একগুচ্ছ ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়েছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক বৃত্তে ভারতীয় হকি আবার এক উজ্জ্বল রেখা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। গত বছর ভারত প্রথম চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনাল খেলে লন্ডনে। অলিম্পিকসে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল হয়নি হয়তো, কিন্তু তারপর চীনের মাটিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অনায়াসলব্ধ জয় পেয়েছে। যুব জাতীয় দল দেশের মাঠে বিশ্বকাপ জিতেছে। এসব ওই পরিকল্পনার ফল। এভাবে চলতে থাকলে ২০১৮ ভারতের জন্য গৌরবময় দিকচক্রবাল গড়ে দেবে।

অশ্বিনী নাচাপ্পা--- অ্যাথলেটিক্সের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি অতটা আশাবাদী নই। এবছর আগস্টে লন্ডনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। সেখানেই বোঝা যাবে ভারতের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড পারফরমাররা কেমন অবস্থায় আছেন। তার আগে অবশ্য রাঁচিতে এশিয়ান মিট। সেখানেও কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। তবে এশিয়াড এবং কমনওয়েলথে খুব বেশি পদক আসবে না আগের মতো।

খাজান সিংহ—সাঁতারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, সুইমিং ফেডারেশন যথাসাধ্য করছে কিন্তু সেভাবে প্রতিভাবান সাঁতারুর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না যারা আন্তর্জাতিক স্তরে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারে। সবাই জাতীয় স্তরে বেশ ভাল কিন্তু বিশ্ব কেন

জগবীর সিংহ

খাজান সিংহ

অশ্বিনী নাচাপ্পা

এশিয়মানেরই ধারে কাছে নেই। আসলে ভারতীয় সাঁতারে একজন দীপা কর্মকার বা মেরি কমকে দরকার, যারা একক দক্ষতা ও বীরত্বে খেলাটির চালচিত্র বদলে দিতে পারে।

□ আইওএ এবং কেন্দ্র মিলে যে মনিটরিং কমিটি গড়েছে তার সার্থকতা কতখানি?

জগবীর সিংহ— সাধু উদ্যোগ, অনেক আগে এ ধরনের কমিটি হলে ভারত অলিম্পিকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের তকমা মুছে ফেলতে পারত। সারা দেশের সব খেলায় কে কেমন অবস্থায় আছে, তাদের ট্রেনিং, খাওয়া-দাওয়া কেমন চলছে, ক্রীড়া ফেডারেশনগুলি কতটা স্বচ্ছভাবে সব কাজ করছে তার ওপর কেন্দ্রীয় স্তরে একটা নজরদারির ভীষণ প্রয়োজন। এই কমিটি প্রতি তিনমাস অন্তর সরকার এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থাকে রিপোর্ট দেবে সব খতিয়ে দেখে। তার ভিত্তিতে নতুন কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হবে, সুযোগ সুবিধে বাড়ানো হবে। এভাবেই উন্নতি সম্ভব।

অশ্বিনী নাচাপ্পা—আমিও এই মনিটরিং কমিটিতে আছি। নিজের ইভেন্ট অ্যাথলেটিক্সে অনেক ইনপুট দিতে পারি, সারা দেশ ঘুরে অ্যাথলেটিক্সের হাল হকিকৎ দেখে। আমার এবং অন্যদের পরামর্শ মেনে যদি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয় সর্বোচ্চ স্তরে তাহলেই ভাল। আসলে আমাদের দেশে সব পরিকল্পনার খসড়াটুকু হয়, তারপর তার গতি হয় ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। অন্যসব উন্নত দেশে খেলা ও শরীরচর্চা এডুকেশনের থেকেও বেশি গুরুত্ব পায়। তাই সেসব দেশ অনেকাংশে দুর্নীতিমুক্ত এবং সমাজের সব ক্ষেত্রে উন্নত এবং শক্তিশালী।

খাজান সিংহ--- এই প্রক্রিয়া যদি সিস্টেমেটিক ভাবে চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই ৫-১০ বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠবে। তবে কমিটির সব সদস্যকে সব ব্যাপারে সহমত পোষণ করতে হবে। আই ও এ এবং সরকারকেও ইগো বিসর্জন দিয়ে মুক্তমনে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে কার্যকরী রূপ দিতে হবে।

গুরুর আদেশ

বজ্রপাতের শব্দে চমকে উঠল আরুণি। এমন দুর্যোগ সে কখনও দেখেনি। সেই সূর্যাস্তের পর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর, এখনও থামার কোনো লক্ষণ নেই। শুধু বৃষ্টি হলেও বা একটা কথা ছিল, ঝড়ের তাণ্ডবে জানলার কপাটগুলো যেভাবে কাঁপছে ভেঙে না যায়। বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দ শুনতে শুনতে আরুণি একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলায় ঋষি ধৌম্য তাকে ডেকে পাঠালেন। সে যুগে ঋষি ধৌম্য ছিলেন জ্ঞানীগুণী, পণ্ডিত মানুষ। অনেক ছাত্র তাঁর আশ্রমে থেকে লেখাপড়া করত। আরুণি তাদেরই একজন। এদের বেশিরভাগই আরুণির মতো বালক, দু-একজন বয়েসে সামান্য বড়ো।

গুরুকে প্রণাম করে আরুণি বলল, 'আমাকে ডেকেছেন গুরুদেব?'

ঋষি ধৌম্য বললেন, 'একটা কাজ করতে হবে আরুণি। কালকের বৃষ্টিতে খেতের কী হাল হয়েছে একবার দেখে এসো।'

সেকালে মুনিঋষিরা রাজানুগ্রহে নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। সেইসব জমিতে যা ফসল ফলত তাতেই তাদের আশ্রমের সকলের সারাবছরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যেত।

খেতের চেহারা দেখে আরুণির চোখ কপালে উঠল। উঁচু জমির জল ঢালুপথে আল ভেঙে আশ্রমের খেতে এসে পড়ছে। প্রায় সমস্ত ফসল ডুবে গেছে। এখনই প্রায় হাঁটুসমান জল। জল আটকাতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তাকে আল বাঁধতে হবে। নয়তো জল আটকানো অসম্ভব। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। কিন্তু আল তৈরি করা অত সহজ নয়। বিশেষ করে কালকের

বৃষ্টিতে মাটি ভিজে, নরম। যতবার আরুণি আল বাঁধে, জলের তোড়ে নরম মাটি ভেসে যায়। সারাদিন এমনি করে কেটে গেল কিন্তু আরুণির আল বাঁধা হলো না। শেষে একটা বুদ্ধি এলো তার মাথায়। মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল সে। এত সহজ একটা উপায় হাতের কাছেই ছিল অথচ তার মনে পড়েনি।

সূর্যাস্তের পর সব ছাত্র আশ্রমে ফিরল কিনা ঋষি ধৌম্য প্রতিদিন খোঁজ নেন। সেদিন খোঁজ নিয়ে দেখলেন সবাই ফিরেছে। শুধু আরুণি ফেরেনি। কোথায় গেল সে? মনে পড়ল তিনি তাকে খেতের অবস্থা দেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে তো সেই সকালে। এতক্ষণে তো তার ফিরে আসার কথা!

উদ্বিগ্ন ধৌম্য কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে মশাল হাতে খেতের কাছে গিয়ে দেখলেন খেতের ভেঙে যাওয়া আলে আরুণি শুয়ে আছে। অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'ওখানে কী করছ আরুণি?'

আরুণি বলল, 'গুরুদেব আমি অনেক চেষ্টা করেও আল বাঁধতে পারিনি। তাই নিজের শরীর দিয়ে জলকে আটকে রেখেছি।'

ধৌম্য বললেন, 'উঠে এসো আরুণি। আশ্রমে চলো।'

আরুণি বলল, 'কিন্তু গুরুদেব আমি এখান থেকে উঠে গেলে তো সমস্ত জল আবার খেতে গিয়ে পড়বে। ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।'

ধৌম্য স্মিত হেসে বললেন, 'এখন জলের বেগ কমে গেছে আর ফসলের থেকে তোমার জীবন বেশি মূল্যবান। উঠে এসো, আশ্রমে চলো। আমার কথার মর্যাদা রাখতে তুমি যা করেছ তাতে আমি অভিভূত। আমার আশীর্বাদে একদিন তুমি বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম হয়ে উঠবে। সারা বিশ্ব তোমাকে চিনবে— ঋষি উদ্দালক নামে।'

সোহম মিত্র

ভারতের পথে পথে

রামেশ্বরম্

দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুরম্ জেলার একটি শহর। এটি মান্নার উপসাগরে পাম্বান দ্বীপে অবস্থিত। মূল ভূখণ্ড থেকে ট্রেনে যেতে হয় এই শহরে। ভারতবর্ষের পবিত্র স্থানগুলির মধ্যে রামেশ্বরম্ একটি। ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র সীতামাকে উদ্ধারের জন্য বানর সেনার সহায়তায় শ্রীলঙ্কা যাওয়ার জন্য সেতু নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। সেতুটি রামসেতু নামে পরিচিত। রামেশ্বরম্ থেকে শ্রীলঙ্কা ৪০ কিলোমিটার। এখানকার রামস্বামী মন্দিরের জ্যোতির্লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। রামস্বামী মন্দির ছাড়াও পাম্বান ব্রিজ, ধনুষ্কোড়ি সমুদ্র সৈকত, রামসেতু, অগ্নিতীর্থম্, হনুমানমন্দির, গন্ধমাদন পর্বতম্ বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি

भवान् अन्यथा गृहीतवान्।
তুমি অন্য ভাবে নিলে।

भवत: कृते बहु प्रतीक्षां कृतवान्।
অনেকক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা করলাম।

बहुकालत: तस्य वार्ता एव नास्ति।
অনেকদিন তার কোনো খবরই নাই।

भवत: पत्रम् इदानीम् एव लब्धम्।
তোমার চিঠি এই মাত্র পেলাম।

गच्छाम:, किञ्चिद्दूरम् अहमपि आगच्छामि।
চলো, আমিও কিছু দূর আসছি।

ভালো কথা

টুনটুনির বাসা

আমাদের কলতলার লেবুগাছে দুটো টুনটুনি কয়েকটা পাতা জোড়া লাগিয়ে ছোট্ট একটা বাসা করে তিনটে ডিম পেড়েছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও মা-টুনটুনি একটুও ভয় পায় না। কিন্তু বাবা-টুনটুনি দূরে গাছে বসে জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে। মা বলেছে ডিমে হাত না দিতে। তাহলে নাকি ডিম ফুটবে না। একদিন দেখি ডিম ফুটে তিনটে বাচ্চা হয়েছে। সেগুলি হাঁ করে খালি চিঁ চিঁ করছে। ওদের মা-বাবা মুখে করে পোকা এনে খাইয়ে যাচ্ছে। একদিন দুপুরে ঘরের মধ্যে এসে ওদের মা-বাবা খুব চিৎকার করতে লাগলো। আমি বাইরে গিয়ে দেখি একটা দাঁড়াশ সাপ গাছটায় ওঠার চেষ্টা করছে। বাবা একটা লাঠি এনে চিৎকার করতেই জল যাওয়ার ফুটো দিয়ে পালিয়ে গেল সাপটা। মা বললো ফুটোটা বন্ধ করে দাও। এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে না।

পুষ্কর সরকার, অষ্টম শ্রেণী, কালীতলা, বলরামপুর, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) য়ি স ক ম সা	(১) য় বি ক হ্ন দা র দ
(২) ফা শ র ই মা	(২) ম ং মা স দ বা ধ্য

২৯ মে সংখ্যার উত্তর

২৯ মে সংখ্যার উত্তর	২৯ মে সংখ্যার উত্তর
(১) মুখরোচক (২) জনকল্যাণ	(১) রোগাপটকা (২) যন্ত্রদানব

উত্তরদাতার নাম

(১) রাজেশ দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া (২) শেখর সাঁতরা, বড়জোড়া, বাঁকুড়া
(৩) অনির্বাণ রায়, হলদিবাড়ি, কোচবিহার (৪) সঙ্গীতা সরকার, বালুরঘাট, দ: দিনাজপুর

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শব্দরূপ-৮৩৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

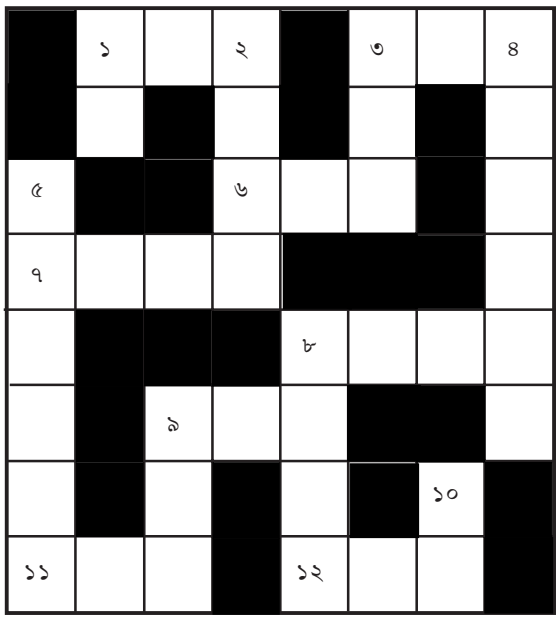

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. তপস্বী, মুনি, **৩.** বেদাদি শাস্ত্র; বনিক সঙ্ঘ, **৬.** জয়ের ইচ্ছা, **৭.** শিব, বুদ্ধদেব, **৮.** হস্তি অশ্ব রথ পদাতিযুক্ত (‘—সেনা’), **৯.** শৃগাল, **১১.** দশমহাবিদ্যার এক, **১২.** পুরাণোক্ত দেবগায়ক।

উপর-নীচ : ১. রামায়ণে বালীর পত্নী (পরে সুগ্রীবের), **২.** এই রায় ছিলেন অস্কারজয়ী চলচিত্র পরিচালক, **৩.** রাবণের মাতা, **৪.** মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ও মহিমা কীর্তনের জন্য রচিত প্রাচীন কাব্য, **৫.** মহাকবি কালিদাসের একখানি কাব্য, **৮.** আগুন জ্বালিবার পাথর, **৯.** সত্যকাম-জননী, **১০.** চাকার পাখি।

সমাধান
শব্দরূপ-৮৩২
সঠিক উত্তরদাতা

শ্যামল রায়
নৈহাটি, নদীয়া
সুশীল কয়াল,
তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া

অ	ছি	লা	■	অ	গ্র	দা	নী
ছি	■	ই	জ্জ	ত	■	■	■
■	ম	ন	■	নু	ড়	কু	ত
■	ধু	■	■	■	■	ট্ট	■
■	মে	■	■	■	■	মি	■
অ	হ	মি	কা	■	মা	ত	■
■	■	■	মি	ছি	ল	■	না
ম	ন্দা	কি	নী	■	পো	লি	ও

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

▯ ৮৩৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ জুলাই ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। ‘চিঠিপত্র’ **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩২

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

With Best
Compliments from

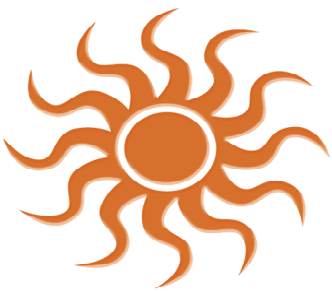

A
Well
Wisher

S.B.

Swastika Weekly, **RNI No. 5257/57** Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
12 June - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।